কালীতীর্থ
কালীঘাট

কলিতীর্থ কালীঘাট

অবধূত

ত্রিবেণী প্রকাশন

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ —জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫
তৃতীয় মুদ্রণ —আষাঢ় ১৩৬৫
চতুর্থ সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৬৫

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
১৭৭-এ, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-৪
মুদ্রাকর
সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
নিউ প্রাইমা প্রেস
বাঁধাই
তৈফুর আলী মিঞা, এ্যাণ্ড ব্রাদার্স
প্রচ্ছদ শিল্পী
রণেন আয়ন্ দত্ত

দাম চার টাকা

জননী

প্রভাবতী দেবী

এই লেখকের বই

মরুতীর্থ হিংলাজ

বশীকরণ

উদ্ধারণপুরের ঘাট

বহুব্রীহি

শুভায় ভবতু

মিড় গমক মূর্চ্ছনা

অবধূত অকপটে স্বীকার করছে—

জীবিত বা মৃত কাউকে এই গ্রন্থে কোনও ইঙ্গিত করা হয় নি, তীর্থস্থানের এতটুকু অমর্যাদা করার বাসনায় এ গ্রন্থ লেখা হয় নি, শুধু মানুষের গান গাওয়া হয়েছে। সুখে-দুঃখে-গড়া মানুষ, যে মানুষ তীর্থের চেয়ে বড়, ধর্মের চেয়ে বড়, জীবন ও মরণের চেয়ে ঢের বড়। এ হল সেই মানুষের গাথা। এর বেশী আর কিছু নয়।

আশা তৃষ্ণা জুগুপ্সাভয়বিশদঘৃণামানলজ্জাভিষঙ্গাঃ।
ব্রহ্মাগ্নাবষ্টমুদ্রাঃ পরস্বকৃতিজনঃ পচ্যমানঃ সমন্তাৎ॥
নিত্যং সংখাদয়েত্তানবহিতমনসা দিব্যভাবানুরাগী।
যোহসৌ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডে পশুগণ বিমুখোরুদ্রতুল্যো মহাত্মা॥

সবই গরল।

সবই গরল।

সবই গরল।

ঘুরছে। ঘুরে ঘুরে এগিয়ে আসছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, আবার ঘুরে আসছে। গরল নয় সুধাও নয়—ছাগশিশুর কণ্ঠে অন্তিম আকুতি।

এ গলি ও গলি সে গলি নয়, একই গলি। ইট-বাঁধানো অন্ধকার গলিটা সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পড়ে আছে। দিনের আলো যায় না, রোদও পৌঁছয় না, আকাশের ছোঁয়া লাগে না।

মহামায়া কালী ভগবতী, ও সবই তো এক। একটা গলিকেই ভাগ ভাগ করে তিন নামে ডাকা হয়। দু পাশের একতলা দোতলা তেতলা বাড়ির দরজা-জানলা সব বন্ধ। গলির প্যাঁচের মুখে মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এক-একটা এক-চোখো দৈত্য। মুখ উঁচু করে দেখলে দেখা যায় সেই চোখটা, যে চোখে আলো নেই আগুন নেই, আছে শুধু একটা ফ্যাকাশে দীপ্তি। কোনই লাভ হয় না তাতে, গলিগর্ভের আঁধার ঘোচে না একটুও। তাই কেঁদে মরে একটা সুর প্রতি রাতে সেই গলির মধ্যে।

"দেবার মত অবিরত আছে শুধু নয়নজল।
জানাই তোরে ওমা শ্যামা আর যা আছে সবই গরল॥"

ওরা সব ওই দিকেতেই থাকে।

ওরা হল তীর্থবাসীর দল।

ওরা তাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও শোনে, "আর যা আছে সবই গরল।"

তীর্থবাসীরা ঘুমায়, ঘুমায় তাদের মা কালীও।

সারাদিনের হৈ-হুল্লোড় খেয়োখেয়ি খেঁচাখেঁচি, না-ধোয়া শাল-পাতার ঠোঙায় পিণ্ডি-চটকানো কাঁচাগোল্লার ভোগ খাওয়া, সে কাঁচা-গোল্লার ছানা ক্ষীর যে কোন্ জীবের দুধ থেকে বানানো তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী মা নিজেও জানেন না। তবু সে ভোগ খেতে হয় মাকে। ভোর থেকে রাত দশটা এগারটা বারোটা পর্যন্ত সমানে চেখে যেতে হয় সেই পিণ্ডি-চটকানো সন্দেশ। নয়তো ওরা যে ঘুমতে যাবে খালি পেটে।

ওরা যে ওই দিকেতেই থাকে।

ওরা যে তীর্থবাসীর দল।

ওরা যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও শোনে—

"দেবার মত অবিরত আছে শুধু নয়নজল।
জানাই তোরে ওমা শ্যামা আর যা আছে সবই গরল॥"

জড়িয়ে জড়িয়ে গাইছে। গাইছে আর ঘুরে বেড়াচ্ছে গলিতে গলিতে। দু পাশের বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ, বন্ধ দরজা-জানলার ওধারে যারা ঘুমিয়ে আছে তারা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বলে দিতে পারে, কে গাইছে ও গান। শুধু বলতে পারে না, কেন ও ওভাবে গান গেয়ে বেড়ায় সারা রাত! সারা রাত মানে, কালীর যখন রাত হয় তখন। কালীর রাত হয় মহানিশা-অতিমহানিশায়। কালীর রাত হয় অনেক দেরিতে—

"দিবা চার্ধপ্রহরিকা চান্তে পরমেশ্বরী।
ঋতুদণ্ডাত্মিকা তস্মাদ্ রাত্রিরুক্তা মনীষীভিঃ॥"

রাতের প্রথম আধ প্রহর আর শেষ আধ প্রহর রাতই নয়—দিবা। প্রথম আধ প্রহর পর ছ দণ্ড হল রাত্রি। তারপরের দশ দণ্ড হল নিশা আর মহানিশা। নিশা মহানিশাকে বলে সর্বদা, তাতে সর্ব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায়।

"সর্বদা চ সমাখ্যাতা সর্বসাধন কর্মণি"

আধ প্রহর হল দেড় ঘণ্টা, তারপর ছ দণ্ড হল আরও দু ঘণ্টা চব্বিশ মিনিট। অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে অন্তত চার ঘণ্টা পার হয়ে গেলে তবে নিশা-মহানিশা শুরু হয়। রাতের শেষ প্রহরের আগেই শেষ হয়ে যায় মা কালীর রাত। তাই মাঝরাতেই শুনতে পাওয়া যায় সেই গান। এ গলি ও গলি সে গলি দিয়ে এগিয়ে আসে। সবাই জানে কে আসছে ও-গান গাইতে গাইতে, সকলেই চেনে তাকে, সকলেই ওকে এড়িয়ে চলতে চায়। তাই মহানিশা ছাড়া ও মুখ দেখায় না কাউকে। কারণ মহানিশায় ওর মুখ-দর্শনের জন্যে কেউ হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে না।

"জানাই তোরে ওমা শ্যামা আর যা আছে সবই গরল।"

দাঁড়িয়েছে এবার।

কালীর সামনে দক্ষিণ দিকের গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছে। গেট বন্ধ, ভেতরের নেপালী চৌকিদাররা চেনে ওকে। সবাই ওকে চেনে, কিন্তু ওর কাছে ঘেঁষতে চায় না। ভেতরের চৌকিদাররা আরও ভেতর দিকে সরে যায়। ও দাঁড়ায়, লোহার গেটের ফাঁকে যতটা সম্ভব মুখখানা গুঁজে দিয়ে বার বার শোনাতে থাকে—

"জানাই তোরে ওমা শ্যামা আর যা আছে সবই গরল
দেবার মত অবিরত আছে শুধু নয়নজল॥"

তারপর ও আর ওর নয়নজল দূরে সরে যেতে থাকে। মায়ের বাড়ির পুবে কুণ্ডের ধারে আর একবার শোনা যায় ওর গলা, আবার শোনা যায় হালদারপাড়া লেনের ভেতর থেকে। ক্রমে মিলিয়ে যায় সেই কান্না, ডুবে যায় অন্ধকারের বুকে। কলিতীর্থের আঁধার আকাশের মুখ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে তখন। এবার সেই ফ্যাকাশে মুখে ফুটে উঠবে হাসি, আলোর হাসিতে ঝলমল করে উঠবে কলিতীর্থের কালো মুখ। কান্নার স্থান নেই সেই মুখে। তাই কান্না অন্ধকারের বুকে মুখ লুকোয়।

কংসারি হালদার মশায় চুপিচুপি উঠে পড়েন তখন তাঁর রাতের শয্যা ছেড়ে। এতটুকু শব্দ না করে চোরের মত পা টিপে টিপে নীচে নেমে আসেন। একটিও আলো জ্বালেন না, একজনকেও ঘুম থেকে ওঠান না, সোজা গিয়ে ঢোকেন কলঘরে। মিনিট পনেরোর মধ্যে হাত-মুখ ধোয়া শেষ করে নিঃশব্দে গিয়ে সদর-ঘরের দরজা খোলেন। সদর-ঘরে থাকে তাঁর জুতো জামা, আলো না জ্বেলে অন্ধকারেই তিনি জামা গায়ে দেন, জুতো পায়ে গলান। তারপর রাস্তার দিকের দরজা খুলে বাইরের রকে গিয়ে দাঁড়ান। বাইরের দিকের দরজায় তালা লাগিয়ে

নেমে পড়েন ইট-বাঁধানো গলিতে। রইল বাড়িসুদ্ধ মানুষ ঘুমিয়ে। যখন ওঠে উঠবে, উঠে বেরিয়ে যদি আসতে হয় কাউকে পথে, তো বেরবে সদর-দরজা দিয়ে। সদর-দরজা তো আর তিনি বন্ধ করে যাচ্ছেন না, বন্ধ থাকছে সদর-ঘরের বাইরের দিকের দরজা। সদর-ঘরে কেউ সাত-সকালে ঢুকতেও আসবে না।

কংসারি হালদার হাঁটতে শুরু করেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা কামাই নেই তাঁর ভোর রাতে হাঁটার। কিছুতেই নয়, আকাশ ভেঙে মাথায় নামলেও নয়। এক পথ, এক রকম চলা, একই দৃশ্য দেখা, মানে—মনে মনে দেখা। দিনের পর দিন, মানে—রাতের পর রাত, সমানে তিনি হাঁটেন। বর্ষায় মাথায় থাকে ছাতি, শীতে থাকে মাথায় এক ফালি গরম কাপড় জড়ানো, আর কি শীত কি বর্ষা হাতে একগাছা পাকা বাঁশের লাঠি থাকেই। মাথা পর্যন্ত নয়, কোমর পর্যন্ত উঁচু একখানা, যার মাথাটা রুপো দিয়ে বাঁধানো। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব ঋতুতেই লাঠিখানা হাতে থাকে তাঁর। তা হল বইকি, প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর পার হতে চলল লাঠিখানার বয়েস, ওখানা সমানে চলেছে হালদার মশায়ের সঙ্গে শেষ-রাতভ্রমণে। আগে হালদার মশায় লাঠিখানা বয়ে নিয়ে যেতেন, এখন লাঠিখানাই ওঁকে টেনে নিয়ে যায়। হালদার মশায়ের হাত ধরে নিয়ে যায় লাঠিখানা, এ কথা বললেও বলা চলে। রোজ স্নান করার আগে তেলহাতটা দুবার লাঠিখানার গায়ে বুলিয়ে দেন তিনি, খুব যত্ন করে আদর করে তেলটুকু ঘষে দেন লাঠি-খানার গায়ে। যেন ছেলের গায়ে তেল মাখাচ্ছেন—তা ছেলেই তো, ছেলেই বলা চলে লাঠিখানাকে। এমন ছেলে যে ছেলে বাপের হাত ধরে নিয়ে যায় অন্ধকার রাতের মহানিশা থাকতে থাকতেই; পৌঁছে দেয় সেখানে, যেখানে দিনান্তে, না না, দিনান্তে নয়, নিশান্তে একটিবার না পৌঁছলে বাপের প্রাণে প্রাণ থাকে না। তাই ছেলে নিয়ে যায় বাপের হাত ধরে সেখানে। যাকে বলে অন্ধের যষ্টি, তাই হল ওই লাঠিখানি হালদার মশায়ের কাছে।

কিন্তু কোথায় পৌঁছে দেয় তাঁকে!

পড়ে আছে সব মড়াখেকো মড়ারা।

রোজই যেমন পড়ে থাকে।

কাদায় ধুলোয় পাঁকে, গরু-ঘোড়ার গোবরে, ছেঁড়া কলাপাতা পচা শালপাতা আর রাশীকৃত ন্যাকড়ায় সমস্ত পথ ছয়লাপ। ওর মাঝখান দিয়েই অতি সাবধানে কোনও কিছু না মাড়িয়ে পথ চলতে হয়। কংসারি হালদার মশায় জানেন, খুব ভাল করে জানেন, পথের এই জঞ্জালগুলো সজীব। ভাঙা ভাঁড় খুরি সরার ওপর পা পড়ে হালদার মশায়ের, সেগুলো মড়মড় করে ওঠে। ও জাতের মড়মড়ানিতে ঘাবড়ান না তিনি। কিন্তু দৈবাৎ যদি পা পড়ে কোন ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলির ওপর, তা হলে মড়মড় করে উঠবে না বটে, কিন্তু ককিয়ে কেঁদে উঠবে নিশ্চয়ই কেউ। মুখখিস্তি করতে লেগে যাবে হয়তো অনেকে। হাতে পায়ে দগদগে ঘা-ওয়ালা তেলেঙ্গীগুলো আবার নোঙরা ছুঁড়ে মারে। রাতের নোঙরাটা ওরা নিজেদের পাশেই রেখে দেয় কিনা, ভোর হলে ওদের সঙ্গী-সঙ্গিনীরা এসে সেগুলো সরিয়ে নিয়ে গঙ্গায় দিয়ে আসে। ওরা যে কারও সাহায্য না পেলে নড়তে পারে না।

হালদার মশায় বাঁশের লাঠিটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘষে পথ করে চলেন। লাঠির মুখে ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলি ঠেকলে তিনি টের পান। তখন্ সাবধান হয়ে পা ঘষে ঘষে পাশ কাটান।

গলি থেকে বেরুলেই মায়ের দক্ষিণ দিকের গেটের বাইরের আঙিনা। আঙিনায় পড়লে নাকই বলে দেয় কোথায় পৌঁছল। গেটের ভেতর থেকে পচা রক্তের গন্ধ বাইরে পর্যন্ত ছড়ায়। ওদিকটা ওই রক্তের গন্ধে মাত হয়ে থাকে অষ্টপ্রহর। কম তো নয়, কোটি কোটি বলি হয়ে গেছে ওখানে। ধর, সেই রাজা মানসিংহের আমল থেকে। বলি অবশ্য শুরু হয়েছে সে আমলেরও আগের আমল থেকে। কম কথা তো নয়। একেবারে জলজ্যান্ত জাগ্রত মহাপীঠ যে! বলির বলি তস্য বলি মহাবলি পর্যন্ত হয়ে গেছে। হালদার মশায়ের নাড়ী-কাটা ইস্তক ওই ভ্যাপসা গন্ধ উনি নাকে শুঁকছেন। নাড়ী-কাটার আগে মায়ের পেটে থাকতেও

শুঁকেছেন। তাঁর বাপ, বাপের বাপ, তস্য বাপের বাপের বাপও মায়ের পেটে বসে ওই গন্ধ শুঁকেছেন। বড় পবিত্র গন্ধ ও জিনিসের। কংসারি হালদার এসে দাঁড়ালেন গেটের সামনে, বন্ধ গেটের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে ঠিক দেড় মিনিট বিড়বিড় করে কী বললেন! তারপর চললেন লাঠি ঠক ঠক করে। ঘুরলেন ডান দিকে, কয়েক পা এগিয়েই নামলেন নহবতখানার সামনে। সব ঠিকঠাক হয় রোজ, ভুল হবার জো কি! কম তো নয়, নাড়ী-কাটার পরদিন থেকে ঠিক না হলেও, অন্নপ্রাশনের পরদিন থেকে ঠিক এই পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন হালদার মশায়। কাজেই ভুল হবার জো কোথায়!

অন্নপ্রাশনের পরে অবশ্য বেশ কিছুকাল কারও কোলে চেপে ঘুরেছেন ওসব জায়গায়। এখন ঘুরছেন লাঠির ঘাড়ে চেপে। কাজেই অসুবিধের কিছু নেই। মুখস্থ—সবই মুখস্থ, আগাগোড়া সারা জীবনটাই একদম মুখস্থ কণ্ঠস্থ ঠোঁটস্থ হয়ে আছে হালদার মশায়ের। কাজেই ভুল হবে কী করে!

কিন্তু আরও বেশী সাবধান হতে হয়।

নহবতখানার সামনের পাথরের টালি-বাঁধানো রাস্তাটার সবটুকু রাতের শয্যা কিনা! মোটে ফাঁক থাকে না এতটুকু। তবে ওরা সবাই জানে কখন হালদার মশায় ওই পথ ব্যবহার করেন। লাঠির শব্দ উঠলেই একটু নড়েচড়ে সরে কোনও রকমে এক ফালি পথ করে দেয় ওরা।

হালদার মশায় এগিয়ে চলেন, এগিয়ে গিয়ে বড় রাস্তাটা পার হন। তারপর ঢোকেন মায়ের ঘাটে যাবার পথে, সোজা এগিয়ে চলেন গঙ্গার ঘাটে।

গঙ্গা।

মরে গেছে। তা যাক, তবু তো গঙ্গা। এক সময় তো বেঁচে ছিল। যখন বেঁচে ছিল, তখন অনেক মড়ার নাভি আর অস্থি বয়েছে। এখন

নিজেই গেল মরে। তা যাক, উদ্ধার হয়ে গেলেন মা'গঙ্গা নিজেই। এতকাল সবাইকে উদ্ধার করতেন, এবার নিজে উদ্ধার হয়ে বাঁচলেন, ভালই হল।

কিন্তু কেওড়াতলার ঘাটটিও এবার গেল। হালদার মশায় মনে মনে হাসেন। কংসারি হালদার মশায়ের পিতা—দৈত্যারি হালদার মশায়ের তিন দিন কাটে গঙ্গার তটে। তাঁকে অন্তর্জলি করা হয়েছিল। মানে—তিনি 'অর্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে অর্ধ অঙ্গ থাকবে স্থলে' অবস্থায় সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেছিলেন। কংসারি হালদার মশায় মনে মনে হাসতে লাগলেন। এখন যদি ওই রকম ভাবে মরবার সাধ হয় কারও, তা হলে তার অর্ধ অঙ্গ পুঁততে হবে মাটির মধ্যে। গঙ্গা তো শুকনো খটখট করছে। এক বিন্দু জল নেই কোথাও, এমন কি পচা পাঁক পর্যন্ত নেই।

খান-দুই নৌকো সেই শুকনো ডাঙায় পড়ে আছে, মাড়িয়ে পার হতে হয়। ওপারের মাচায় একটা পয়সা দিতে হয় পারানি। নয়তো অন্য যেখান দিয়ে মর্জি হেঁটে পার হও। এক পয়সাও কেউ চাইবে না, পায়ে এতটুকু কাদাও লাগবে না।

পায়ে কাদা না লাগুক কিন্তু খেয়ার কড়ি ফাঁকি দিতে নেই। হালদার মশায় তা দেনও না কোনও দিন। লাঠি ঠুকে ঠুকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান। লাঠির মুখ দিয়ে ঠাওর করে দেখে নেন নৌকার কোণটা। তারপর ঠুক ঠুক করে নৌকা দুখানার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ান মাচার সামনে। পয়সাটা ঠিকই থাকে রোজ ঠিক জায়গায়। বার করে মাচায় ছুঁড়ে ফেলতে একটুও সময় নষ্ট হয় না ওঁর। সময় নষ্ট হয় বর্ষাকালে, যখন একটু আধটু জল থাকে খালে, ভক্তি করে যাকে বলা হয় আদিগঙ্গা। আদিগঙ্গায় জল থাকলে নৌকো দুখানা টলমল করে, তখন পা ঠিক রেখে পেরিয়ে আসতে একটু কষ্ট হয়, একটু সময়ও নষ্ট হয়।

তারপর এ গলি দিয়ে ও গলিতে গিয়ে পড়েন। বাঁ দিকে ঘুরে অল্প একটু হেঁটে ঠিক জায়গায় পৌঁছন। একটা ছোট জানলার গায়ে লাঠিটা

ঠোকেন ছু-তিন বার। জানলাটা অনেক উঁচুতে, প্রায় হালদার মশায়ের মাথা ছাড়িয়ে। তাই লাঠির নীচের দিকটা ধরে মাথার দিক দিয়ে ঘা দেন জানলায়। রোজই দেন।

জানলাটার ভেতর থেকে সাড়া আসে, "কে ?"

"আমি।" হালদার মশায় বলেন শুধু, "আমি।" বাস্, যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হল।

মিনিট ছুয়েক আর কোনও সাড়াশব্দ নেই, এ পক্ষেও না ও পক্ষেও না। তারপর ডান ধারের এক হাত চওড়া গলির মুখে দেখা দেয় একটা আলো। একজন বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় হালদার মশায়ের পাশে। তাঁর হাত ধরে বলে, "এস।"

হাত ধরে 'এস' না বললে হালদার মশায় নড়েন না একটুও। এমন কি নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলেন না তিনি। এই হাত ধরা আর 'এস' বলার অপেক্ষায় দম বন্ধ কবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

আব একবাব শোনা যায় 'এস'। এই 'এস'টির সুরই অন্যরকম। এই ছুটি অক্ষরের ছোট্ট শব্দটি শোনা যায় যখন ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন হালদার মশায়। তখন কিন্তু কেউ হাত ধরে না তাঁর। তখন লাঠি ঠক ঠক করেও চলতে হয় না তাঁকে। সেই সাত-সকালে যারা রাস্তার কলে জল নেবার জন্য বেরয়, তারা তাঁকে লাঠিখানা বগলে গুঁজে হনহন করে রাস্তা পার হতে দেখে ধারণাই করতে পারে না, আকাশে আঁধার থাকলে এই মানুষটি আঁধার দেখে জগৎ। সন্ধ্যা পার হবার আগেই এঁর ছুই চোখে এমন আঁধার ঘনিয়ে ওঠে যে, ইনি ওঁর ওই লাঠির চোখ দিয়ে ছাড়া নিজের চোখে কিছুই দেখতে পান না।

নিশি পোহায়।

মিছরি মশায়রা গিয়ে মায়ের দরজার তালা খোলেন, লোকচক্ষুর অন্তরালে মায়ের সাজসজ্জা শুরু করে দেন। ফলমূল দিয়ে আমান্ন নৈবেদ্য সাজান। পৌঁছে যান তখন ভট্‌চায মশায়ও। মায়ের নিত্যপূজা শুরু হয়।

সবই হাত চালিয়ে করতে হয় তখন। শান্তিতে ধীরে সুস্থে যে একটু স্নান করবেন বা জলটল খাবেন মা, তার ফুরসত কোথায়! সবাই এসে পৌঁছে গেছে কিনা ইতিমধ্যে। প্রতিটি মিনিটের মূল্য আছে। মিনিট জুড়ে জুড়ে হয় ঘণ্টা, ঘণ্টা জুড়তে জুড়তে হয় দিন। দিনটা আবার কিনে ফেলেছে কিনা একজন। নগদ টাকা দিয়ে কিনেছে। দয়াময়ী মা যদি মুখ তুলে চান, তা হলে কী-ই না হতে পারে! না হতে পারে কী? পাঁচ শো টাকা দিয়ে পালা কিনলে, পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হাজারই বা হতে কতক্ষণ!

অবশ্য হয় না তা কিছুতেই, হবার জো আছে নাকি কিছু হাড়-হাবাতেদের জ্বালায়! ওই যে আদুড় গায়ে, কোমরে গামছা বেঁধে, গলায় এক গোছা পৈতে ঝুলিয়ে, কপালে ইয়া বড় সিঁদুরের গুল লাগিয়ে, পোড়া কয়লার বর্ণ, গুচ্ছের পাকানো মূর্তি এসে ঢুকেছে মায়ের বাড়িতে, ওই যে মাথার ওপর উঁচু করে ধরে রয়েছে সকলে ছোট ছোট চুপড়ি। ওই যে ওধারে নাটমন্দিরে উঠে সব বসছে আসন বিছিয়ে, রক্ত-বস্ত্র পরা, গলায় মাথায় কোমরে হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষের বিচি বাঁধা, লম্বা-চুলো সাধক-পুঙ্গবের দল, যাদের অসাধ্য কর্ম কিচ্ছু নেই এই দুনিয়ায়। মারণ উচ্চাটন বশীকরণ স্তম্ভন থেকে শুরু করে রেসের ঘোড়ার নম্বর পর্যন্ত বলে দিতে পারে যারা মক্কেলকে। শুধু পারে না, নিজেদের অবস্থাটা একটু ফিরিয়ে রোজ মায়ের বাড়ি এসে তীর্থের কাকের মত মুখিয়ে বসে থাকার হাত থেকে নিজেদের পরিত্রাণ করতে। এতগুলো

হন্যে হাঙরের হাঁ-করা গ্রাস থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যদি কিছু পড়ে মায়ের হাতে পায়ে গায়ে, তা কুড়িয়ে আর কতই বা হয়! যা হয়, তা দিয়ে পালার খরচও ওঠে না। অনর্থক দিকদারি ভোগের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যেই হালদার মশায়রা বেচে দেন পালা। যা, মর্‌গে যা, যা তোদের কপালে মা দেয় কুড়ো গিয়ে। মায়ের সেবা পূজোর এতটুকু অঙ্গহানি না হয়, এইটুকু দেখাই হল আমাদের কাজ। বাস্‌, এইটুকু যতদিন মা করাবেন, ততদিন করব। কে যাচ্ছে মায়ের দরজার পয়সা কুড়তে, যা নগদ পাওয়া যায় তাই ভাল। মায়ের সেবা পুজোয় লাগে বড় জোর একশো শোয়াশো টাকা, ওর ওপর যা মেলে তাই যথালাভ।

তা পালা বেচে দিলেও নজর রাখতে হয় সব দিকে ওঁদেরই। আসলে ওঁরাই হলেন মায়ের সেবায়েত। ওঁরা তো ভুলতে পারেন না ওই হৈ-হট্টগোল হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি খেয়োখেয়ির মাঝে মা কাউকেই চেনেন না জানেন না, কারও কথাই কানে তোলেন না। চেনেন শুধু নিজের সেবকদের, চোদ্দপুরুষে যারা মার নোকর, মা শুধু তাদেরই চেনেন জানেন। হঠাৎ কোনও কিছুর দরকার যদি হয় মায়ের, তাই যতক্ষণ মন্দিরের দরজা খোলা থাকে, নোকর-বংশের কেউ না কেউ ঠিক হাজির আছেন মায়ের বাড়িতে। ওঁরা মাকে স্পর্শ করেন না সহজে, সে কাজ ওই মিছরিদের ; ওঁরা মায়ের পুজো করেন না, সে কাজ ভট্টচাযদের। ওঁরা মায়ের ভোগ রাঁধেন না, তার জন্যে লোক নিযুক্ত করে রেখেছেন যারা রাত দশটা পর্যন্ত উপোস করে থাকবে। ওঁরা সত্যি কিচ্ছু করেন না, ওঁরা করান। আর যদি দৈবেসৈবে নিজেদের কোনও যজমান আসে মায়ের বাড়ি, এসে অন্য কোনও ঘড়েলের গ্রাসে না পড়ে খুঁজে বার করে ওঁদের, তখন সসম্মানে নিজের যজমানকে নিয়ে গিয়ে ঢোকেন মায়ের ঘরে। পূজা করান, অঞ্জলি দেওয়ান, মায়ের আশীর্বাদী হাতে দিয়ে যজমানকে বার করে নিয়ে আসেন মায়ের বাড়ি থেকে। যজমান মায়ের হাতে পায়ে কি দিল না-দিল, ফিরেও তাকান না সে দিকে। মায়ের বাড়ির বাইরে এসে যজমান যদি কিছু প্রণামী

দিয়ে প্রণাম করে, তবে তাই যথেষ্ট। ওঁরা যে মায়ের খাস সেবায়েত।
ওঁরা কি ফেউ ফেউ করতে যাবেন নাকি লোকের পেছনে!

ফেউরাও ততক্ষণে তৈরী হয়ে গেছে ফেউ ফেউ করার জন্যে।

ভেতরে এরা বাইরে ওরা। সেই ন্যাকড়া-কানি-জড়ানো সজীব হাড়-মাংসগুলো হন্যে হয়ে উঠেছে বাইরে। পুবে কালী টেম্পল রোডের শুরু থেকে রাস্তার দু পাশ জুড়ে থিকথিক করছে ওরাই। গড়াচ্ছে, কাতরাচ্ছে, কেঁদে ককিয়ে লোকের নজর ফেরাবার মর্মান্তিক চেষ্টা করছে রাস্তার পাশে পড়ে। যারা চলতে পারে হাঁটতে পারে, তারা দৌড়চ্ছে মানুষের পিছু পিছু। ওদের আবার সীমানা ভাগ করা আছে। যারা ওই কালী টেম্পল রোডে পাহারা দেয়, তারা ছুটতে ছুটতে আসে হালদারপাড়া লেনের মুখ অবধি। আবার এধারের যাত্রী যারা ওধারে ফিরে যায়, তাদের পিছনে ছুটতে ছুটতে গিয়ে পৌঁছয় সদানন্দ রোডের মোড়ে। হালদারপাড়া লেনের মুখ থেকে আরম্ভ করে এক দলের চৌহদ্দি। ওরা ওদের শিকার ধরে, মায়ের বাড়ির পুবদিকের কুণ্ডের পাড়ে আর উত্তর দিকটার সারা রাস্তাটায়। আবার কালীঘাট রোড হল আর একদলের সীমানা। তারা আবার নহবতখানার সামনের পথটুকুতে কিছুতে ঘেঁষতে পারে না। গঙ্গার ঘাটের রাস্তাগুলোয় যারা থাকে, তারা এদের কাউকে ওদিকে দেখলেই কামড়ে খেতে আসে। নিজেরাই নিজেদের মধ্যে ভাগযোগ করে নিয়েছে। কাজেই বড়-একটা কামড়া-কামড়ি হয় না ওদের মধ্যে।

কিন্তু এদের মধ্যে তাও হয়।

কারণ এরা কোনও নিয়ম মেনে চলে না। ঘুরছে, হরদম টহল দিচ্ছে। হন্যে পশুর দৃষ্টি এদের চোখে, ঠিক চিনে ফেলছে প্রকৃত শিকার কোন্‌টি। আর অমনি পাঁচজনে মিলে চিলের মত ছোঁ মেরে গিয়ে পড়ছে শিকারের ঘাড়ে। এদের সীমানারও সীমা-পরিসীমা নেই। সেই ওধারে পোলের মুখে যেখানে কালীঘাট রোডের আরম্ভ, সেখানে

এরা আছে, কালীঘাট ট্রাম ডিপোতে আছে, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীটে আছে, ঘাটে ঘাটে আছে। কোথায় নেই এদের সজাগ শ্যেন দৃষ্টি! কোথায় না শুনতে পাওয়া যায় এদের করুণ কুণ্ঠিত মিনতি, "এই যে, দর্শন করবেন না কি? আসুন না এধারে, বেশ ভাল ব্যবস্থা রয়েছে।" কিংবা "ডালাটালা কিছু নেবেন না কি মা? আসুন না এধারে, ভাল-ভাবে দর্শন করিয়ে দিচ্ছি।" আবার ওরই মধ্যে যারা একটু বেশী চালাক, তারা দাঁত বার করে এগিয়ে আসে, যেন কতদিনের চেনা-পরিচয়, "আসুন বাবু, আসুন। সেই যে গতবার, আমিই আপনার কাজকর্ম করে দিলাম।" শিকার যদি সত্যিই শিকার না হয়, তা হলে গম্ভীরভাবে ওদের দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে চলে যায়। দাঁড়িয়ে একটি কথা বললেই আর রক্ষে নেই। লেগে গেল খেয়োখেয়ি, কে ছিনিয়ে নেবে শিকারটি, তার জন্যে করতে না পারে এরা হেন কর্ম নেই। মুহূর্তের মধ্যে গালমন্দ, এমন কি হাতাহাতি পর্যন্ত লেগে যেতে পারে।

এরাই হল ডালাধরা, ডালা ধরাই এদের পেশা, কলিতীর্থের এরাই হল কাক।

ওরা সব ওই দিকেতেই থাকে।

ওরা হল তীর্থবাসীর দল।

ওরা মায়ের এমন সন্তান যে ওদের সম্বল শুধু নয়নজল।

মায়ের বাড়ি জেগে উঠল।

হয়ে গেল নিত্যসেবা, আমান্ন নৈবেদ্য বেরিয়ে গেল মন্দির থেকে। এবার শুধু ডালা ধরা, ডালা ধরা আর ডালা ধরা। রুখে উঠেছে সকলেই, যা জনা দশ-বিশ যাত্রী এসেছে, তাদের চোখে ধাঁধা লাগাতে হবে। ভিড় দেখাতে হবে, ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করতে হবে, করাতে হবে। মায়ের ঘরে ঢুকে মায়ের পাদস্পর্শ করে আসাটা যে একটা যা-তা কর্ম নয়, সেটুকু সদা সর্বক্ষণ ফলাও করে দেখাতে হবে সকলকে। নয়তো বিলকুল মাটি হয়ে যাবে যে! সুড়সুড় করে যদি মানুষে মায়ের

সামনে যাওয়া-আসা করতে পায়, যদি লোকের একবার ধারণা হয়ে যায় মায়ের সামনে গিয়ে পৌঁছনোটা যমের সামনে গিয়ে পৌঁছনোর মত একটা কঠিন কর্ম নয়, তা হলে আর ওদের পরোয়া করবে কে! তাই ওরা নিজেরাই নিজেদের ঠেলে, গুঁতোয়, চোখ রাঙায়। অযথা চেঁচায়, ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ওঠে আর অনবরত চুপড়ি নিয়ে মায়ের ঘরে ঢোকে বেরয়। এই ওদের কর্তব্য, এইটুকুই ওদের কারবারের কারসাজি।

ঝন ঝন ঝনাৎ, শিকল আছড়াচ্ছে কেউ দরজার গায়ে। "বেরিয়ে এস বেরিয়ে এস"—চিৎকার করছে দরজার মুখ জুড়ে দাঁড়িয়ে। কে বেরিয়ে আসবে, বেরিয়ে আসবার মত আছে না কি কেউ মায়ের সামনে! যারা আছে তারা কিছুতে বেরুবে না। তাদের দায় হল, মায়ের সামনের সামান্য স্থানটুকু দখল করে থাকা আর মায়ের হাতে পায়ে যা কিছু পড়বে তা চোখের পলক ফেলার আগেই তুলে নিয়ে ট্যাঁকে গোঁজা। ওদের বংশাবলীই মায়ের অঙ্গসজ্জা করে, মায়ের নৈবেদ্য সাজায়, মাকে পাহারা দেয়। ওরাই ছুঁতে পারে মাকে। তাই ওদের যে গুষ্টির যেদিন পালা পড়ে, সেদিন সেই গুষ্টির যে যেখানে আছে মাকে ছেঁকাপেঁকা করে ঘিরে থাকে। ওরা বেরিয়ে আসবে কী রকম? যখনই উঁকি দাও মায়ের মন্দিরের মধ্যে, দেখবে একদল মানুষে ছিনে জোঁকের মত লেগে রয়েছে মায়ের গায়ে।

শুধু ভিড় ভিড় আর ভিড়। বাইরে ভিড়, ভেতরে ভিড়, উঠনে ভিড়, নাটমন্দিরে ভিড়। পাঁঠা-কাটার ওধারে ভিড়। নানা জাতের ভিড়। কত রকমের কত মতলব নিয়েই যে মায়ের বাড়ি জেগে রয়েছে সদা সর্বক্ষণ, তা বোঝার সাধ্য মায়ের বাপেরও নেই।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

ডাইনে আনতে বাঁয়ে নেই কারোরই।

বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়, দুপুর গড়িয়ে বিকেলের পিছু ধরে। মায়ের মন্দির বন্ধ হবার উপক্রম হয় তখন। মা এবার ভোগ খাবেন।

সবাই ফিরে চলে যে যার মাথা গোঁজার স্থানে। মনে মনে হিসেব

করে চলে, এ ট্যাকে ও ট্যাকে গোঁজা আছে কত! হিসেব করে মনে মনে আর রেগে কাঁই হয়। ধুত্তোর ডালাধরাঁর মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয়। শালার সাত-সকাল থেকে মায়ের বাড়ি চেটে মোটে ন গণ্ডা পয়সা! নিকুচি করেছে মায়ের।

ফিনকিও ফিরে যায় রোজ একদম খালি আঁচল নিয়ে। আঁচলের কোনও কোণে তাকে গিঁট দিতে হয় না বড় একটা কোনও দিন। কারণ ফিনকি আর ফ্রক পরে না, তাই যাত্রীর জামা কাপড় ধরে টানাটানি করতেও পারে না। "কুমারীকে কিছু দিন"—এ কথাটা বলতেই কেমন যেন তার মুখে বাধে। ফিনকি শুধু দাঁড়িয়ে থাকে মন্দির ঠেস দিয়ে, হয় পুলের নীচে, নয় ষষ্ঠীতলার ওধারে। তাও কারও নজরে পড়লেই তাড়া লাগায়। মায়ের বাড়ির মধ্যে ও সমস্ত আজকাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিনা।

কিন্তু মায়ের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে কাউকে তাড়া করা—মা গো! ওই কুটে কাঙালীগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়নো, ভাবলেই ফিনকির মাথা ঘুরে যায়। তাই সে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মন্দিরের গায়ে ঠেস দিয়ে, আর দাঁত দিয়ে নখ ছেঁড়ে। আবার নজরও রাখতে হয় চারিদিকে, কে যে কখন গায়ে হাত দিয়ে বসবে তার ঠিক নেই। গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে আসবে হয়তো কেউ, কেউবা তাড়াতে এসেও আগে খপ করে গায়ে হাত দেবে। মোটের ওপর গায়ে হাত তার পড়বেই। এমন কী ওই হাফপ্যাণ্ট-পরা পুঁচকে ছোঁড়াটা, ওই যে পেঁচো, চায়ের পেয়ালা ধোয়ার কাজ করছে চায়ের দোকানে, ও ছোঁড়ার সাহসও কম নয়। মনিবকে লুকিয়ে তিন দিন তিন ভাঁড় চা খাইয়েছিল ফিনকিকে। বলেছিল, "আসিস একটু সব দিকে নজর রেখে, চা খেয়ে যাস।" তা ফিনকি কী করে জানবে যে অতখানি সাহস ওর! চায়ের ভাঁড়টা হাতে দিয়েই খপ করে একেবারে—। থু থু, সঙ্গে সঙ্গে ভাঁড়টাই ছুঁড়ে মেরে দিলে ফিনকি ছোঁড়ার বুকে। তারপর দৌড়, দৌড়ে গিয়ে

মিশে গেল ভিড়ের সঙ্গে। ঢুকে গেল মায়ের বাড়ির ভেতরে, ঢুকে মন্দিরের পেছনে চরণামৃত নেবার নর্দামার পাশে মন্দিরের গায়ে মুখ রগড়াতে লাগল। রাগে নয়, দুঃখে নয়, অভিমানেও নয়, এমনি। এমনি অনেকক্ষণ মুখ রগড়াতে লাগল সে। অনেকেই দেখল, কেউই কিন্তু দেখল না, ফ্রক-পরা অন্য সকলে দেখেও দেখল না। কিন্তু একজন দেখল, পেছন থেকে সে বলে উঠল, "ওরে, ও মায়ী, আয় তো মা এদিকে। এই দেখ্ মা, ফিরে দেখ্, ইনি তোকে কী দিচ্ছেন দেখ্।"

ঝট করে ফিরে দাঁড়াল ফিনকি, চিনতে পারল। ভয়ে তার বুক টিপটিপ করতে লাগল। সামনে স্বয়ং হালদার মশায়।

কিন্তু না, হালদার মশায় তাড়াতে আসেন নি তাকে। তিনি তাঁর পাশের ভুঁড়িওয়ালা মারোয়াড়ীকে কী বললেন! আর অমনি সে নগদ চকচকে একটা টাকা দিলে ফিনকির হাতে। টাকাটা হাতে দিয়ে আবার ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। হালদার মশায় বললেন, "যা, এবার পালা, আর কাঁদতে হবে না মন্দিরের গায়ে মুখ ঘষে।" বলে মারোয়াড়ীকে নিয়ে ওধারে চলে গেলেন।

কিন্তু সে ওই এক দিনই। রোজ কি আর মা দয়া করে! তাই রোজ ফিনকি ফিরে যায় খালি আঁচল নিয়ে। তার আঁচলের কোণে গিঁট পড়ে না বড় একটা কোনও দিন।

ফিনকির দাদা ফনা।

ফনা খেলে রেস। তাই তার বিষ নেই, আছে শুধু কুলো-পানা চক্কর। বলে, "জানলি ফিনকি, এবারে ঝেড়ে ধরব পাঁচ সিকের ট্রিপিল টোট। এবার দেখে নিস তুই, মার কাকে বলে। এ বাব্বা একটিবারই হাতে আসে, বল্‌স্‌ সাহেবের আঁস্তাবল—হুঁ-হুঁ।"

আস্তাবলের মুখে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে ফনা হুঁ-হুঁ পর্যন্ত এগোয়। তারপর বন্ধ করে বল্‌স্‌ সাহেবের গুণগান। মাথা নিচু করে এক গরাস ভাত মুখে ঢোকায়। বোধ হয় চিন্তা করতে থাকে, বল্‌স্‌ সাহেবের নামটা করাও সমীচীন হয়েছে কি না! দেওয়ালেরও কান আছে তো, যদিও ছিটে বেড়ার কান আছে কি না তা ঠিক ফনা জানে না এখনও।

ঠিক চার হাত লম্বা আড়াই হাত চওড়া বারান্দাটুকু, এধারে ছিটে বেড়া ওধারে ছিটে বেড়া। মেঝেটা সিমেণ্টের, যাকে বলে পাকা মেঝে। বারান্দার পেছনে ঘর, ঘরের মেঝেও পাকা। তবে দেওয়াল চাল সমস্ত টিনের। ঘরখানিও ঠিক চার হাত লম্বা, একদম বারান্দার সঙ্গে সমান। কিন্তু চওড়াটা অন্তত হাত সাতেক হবে। মানে, ভেতর দিকে অনেকটা চলে গেছে। এই এক মাপের পাঁচখানা ঘর এক চালের নীচে, সামনের বারান্দাটা তাই চার চার হাত ভাগ করা হয়েছে ছিটে বেড়া দিয়ে। ওইখানেই খাওয়া, ওইখানেই রান্না, ওইখানেই বসা দাঁড়ানো সমস্ত। সমস্ত বারান্দাটায় সারি সারি এ বেড়ার ও বেড়ার পাশে পাঁচটা উনুন জ্বলে রোজ। পাঁচ রকমের রান্না হয়। পাঁচখানা ঘরে পাঁচ রকমের সলা-পরামর্শ চলে। ওই মায়ের বাড়ির কথাই হয় প্রায়। যা দিনকাল পড়ল, সকলেই এ সম্বন্ধে একমত, যা দিনকাল পড়ল তাতে আর মায়ের বাড়ি চেটে কিছুতেই দিন চলে না।

ফনা-ফিনকির মা কিন্তু অন্য রকম কথা বলেন। ছেলে-মেয়ের সামনে এনামেলের কানা-উঁচু থালায় ভাত, তা শুধু ভাতই তাকে বলা

চলে, ভাত আর তার সঙ্গে একটু টকের ডাল ধরে দিয়ে খুবই ফিস ফিস করে বলেন তিনি, "ফনা, আর তো চলে না বাবা। না হয় আমায় ছেড়ে দে, কারও বাড়িতে· রান্নার কাজ যদি একটি যোগাড় হয় দেখি।"

ছেলে মেয়ে দুজনেরই মুখে হাত তোলা বন্ধ হয়ে যায়। ফনা কিছু বলার আগেই ফিনকি খু-উ-ব চাপা গলায় গর্জন করে উঠে, "ফের ও কথা বললে আমি লরির তলায় লাফিয়ে পড়ব।"

ফনা চুপি চুপি মিনতি করে মা-বোনকে।

"ফিনকি, তুইও আর বের হস নি ঘর থেকে। খবরদার এক পা দিবি নি পথে। দেখি শালার কী করতে পারি! সন্ধ্যের পর একটা কিছু ফেরি-টেরির কাজই জোটাতে হবে এবার।"

ফিনকি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "সেই ভাল দাদা, খু-উ-ব ভাল হবে তাতে। আমিও যাব তোমার সঙ্গে, ফেরি করে বেড়াব।"

ফনা হেসে ফেলে বলে, "ধুৎ, গরু কোথাকার!"

ফিনকি তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বলে, "না দাদা, কিছুতেই আমি থাকতে পারব না এই ঘরে। দু দিন বন্ধ থাকলে ঠিক দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। দেখো তুমি, এই তোমায় বলে রাখছি—"

ফনার আর শোনার অবসর হয় না। তাড়াতাড়ি একটা কুলকুচো করে সে ছোটে। খাল পেরিয়ে চেতলার বাজারে তাকে পৌঁছতে হবে এখনই। সে গেলে তবে তার মনিব পরানকেষ্ট গুঁই আড়ত থেকে উঠে বাড়ি যাবেন ভাত খেতে। আসা-যাওয়া-খাওয়ার জন্যে ফনা ছুটি পায় মাত্র এক ঘণ্টা, বেলা দুটো থেকে তিনটে। তিনটের পর পরানকেষ্ট গুঁই ভাত খেতে বাড়ি যান। তিনটের একটু দেরি হলেই রেগে টং হন তিনি। তাই ফনা দৌড়য়।

ফনার মা ছেলেকে ডালা ধরতে দেন নি মায়ের বাড়িতে। যে সংসারে তিনি বধূরূপে এসে দুধে-আলতার পাথরে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেটা

ডালা ধরার সংসার ছিল না। কী করে যে কী হয়ে গেল, কিসের থেকে কেমন করে যে তাঁকে এই মরা খালের ধারে এসে টিনের খাঁচায় ঢুকতে হল, কবে থেকে ফনা-ফিনকির বাবা ডালা হাতে নিয়ে মায়ের বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াল, সবই তিনি চোখ বুজলেই দেখতে পান। স্পষ্ট দেখতে পান তিনি, কেমন করে সেই কাঁচা-হলুদ-রঙের নরম শরীরটা পাকিয়ে তেউড়ে পোড়াকাঠ হয়ে গেল। বিড়ি থেকে গাঁজা তারপর আফিম থেকে চণ্ডুতে গিয়ে উঠল নেশার দৌড়। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা হবার প্রত্যাশার আগুন জ্বলে উঠত দুই চোখে, সর্বদেহে শিকারীর বন্য হিংস্রতা জেগে উঠত, ছুটে বেরিয়ে যেত বাড়ি থেকে কোমরে গামছা বেঁধে ডালা হাতে নিয়ে। তারপর ফিরত যখন খালি হাতে খালি পেটে সেই দুপুর গড়িয়ে যাবার পর, তখন একেবারে নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়ে ফিরে আসত মানুষটি। দিনের পর দিন প্রত্যাশা আর হতাশার জোয়ার-ভাঁটা, সেই জোয়ার-ভাঁটার টানে সব শুকিয়ে গেল। শেষে নেশা, নেশার ওপর আরও নেশা, অভাবের নেশা, বাঁচার নেশা, সব রকমের নেশাতেও যখন কুলল না তখন পেয়ে বসল মরণের নেশা। ওই ডালা ধরার নেশায় মানুষকে যে কোথায় নিয়ে নামাতে পারে তার নাড়ীনক্ষত্র সবটুকু মর্মে মর্মে জানেন যে ফনা-ফিনকির মা। তাই তিনি ছেলেকে কিছুতে ডালা ধরতে দেন নি। বহু চেষ্টা তদবির ধরাধরির ফলে ফনা শেষ পর্যন্ত জুটিয়েছে ওই কাজ পরানকেষ্টর আড়তে। পরানকেষ্ট লোকটি ধার্মিক জুতের। কাজে নিয়েই দিন আট আনা দিতে আরম্ভ করেন। শেষে যখন বুঝতে পারেন যে সুবিধে পেলেও ফনা চুরি করে না তখন একেবারে ত্রিশ টাকা মাস মাইনে করে দিয়েছেন।

কিন্তু ত্রিশ টাকার সাড়ে সাত টাকাই চলে যায় ঘর ভাড়ায়। আর বাকী থাকে কত? যা থাকে তা দিয়ে মা বোন নিয়ে ফনা চালায় কী করে!

কী করে যে চলে তা ফনা ভাবতে চায় না। চলে, যে ভাবেই হক চলে, তিনটে মানুষের পেট চলছেই তো ত্রিশ টাকা থেকে সাড়ে সাত টাকা ছেঁটে ফেলে। চালান ফনা-ফিনকির মা। তিনিই জানেন কেমন করে সংসার চালান তিনি।

আর জানে ফনার বোন ফিনকি। এতদিন ঠিক জানত না, এখন সবে একটু একটু জানতে আরম্ভ করেছে।

তখন কুমারী হওয়ার নেশা ছিল।

লুকিয়ে যেত খেলার সাথীদের সঙ্গে মায়ের বাড়ি। হৈ-হৈ হুড়োহুড়ি লাফালাফি করে বেড়াত ওই মায়ের বাড়িতেই ছোট্ট ইজের আর ছোট্ট ফ্রক পরা এক মাথা কোঁকড়া চুল সুদ্ধ এক ফোঁটা মেয়েটা। দরকার পড়লে হালদার মশায়রা হুকুম দিতেন, "ধব্, ধরে আন্ সব কটাকে।" ধরে এনে সার দিয়ে বসিয়ে সকলের পা ধোয়ানো হত আগে, তারপর হাতে হাতে মিষ্টি দেওয়া হত, তারপর চার আনা বা আট আনা নগদ পয়সা। অনেকবার তেলের বোতল সিঁদুর আলতা এমন কি ছোট্ট ডুরে শাড়ি পর্যন্ত পেয়ে যেত। বাড়িতে আনলে মা রাগ করত, "কেন আনলি এ সব?"

"বা রে, আমি কি চাইতে গেছি নাকি?"

"না চেয়েছিস বেশ, কিন্তু খবরদার আর যাবি না মায়ের বাড়ি।"

"হুঁ, কেন, সবাই তো যায়, খেলতে—"

মা গর্জে উঠত, "চুপ মুখপুড়ী, লজ্জা করে না ভিক্ষে করতে?"

ফিনকি চুপই করে যেত। ঠিক বুঝতে পারত না ভিক্ষেটা আবার করা হল কোথায়! কিন্তু বাপ বাড়ি ফিরে লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েকে বলতেন, "যাবি, নিশ্চয়ই যাবি। রোজ যাবি। কেন যাবি নে, বামুনের মেয়ে তুই, লোকে কুমারী করবে তীর্থস্থানে। এতে লজ্জার কী আছে?"

তাই ফিনকি ফের যেত। মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে একবার বেরতে পারলেই সিধে মায়ের বাড়ি। যেদিন যা হাতে পেত, নিয়ে আসত বাড়িতে। বকুনি খেত মায়ের কাছে, তবু এনে মার হাতেই সব তুলে দিত।

আবার এর মধ্যে তার বাবাও দু-একবার দু-একজন যাত্রীকে ধরে তাকেই কুমারী করালেন। পা ধোয়ানো, আলতা পরানো, জল

খাওয়ানো, দক্ষিণা দিয়ে প্রণাম করানো। ভয়ানক ভাল লাগত তখন এ সমস্ত ফিনকির। কেমন একটা নেশা ছিল ঠাকুর হওয়ার। আবার রেষারেষিও ছিল আর পাঁচটা তাঁর মত কুমারীর সঙ্গে। কে কতবার কুমারী হল, কে কী পেল না-পেল, এ নিয়ে রেষারেষি ছিল। দশ-বারো জন জমত তারা মায়ের বাড়িতে। তার মধ্যে একজনকে কুমারী হওয়ার জন্যে ডাকলে অন্য সবাই কেমন যেন মনমরা হয়ে যেত। তখন যেত ক্ষেপে যাকে ডাকা হল তার ওপর।

"আহা! আধিক্যেতা দেখ্ না ধুমসীর!"

"যেন উনিই কত সুন্দরী!"

"তবু যদি না বোঁচা নাক হত!"

"হেংলীর হদ্দ! দেখলি না, জামা ধরে টানাটানি করছিল!"

দেখতে দেখতে দিন পালটাল। কুমারী যে কত জুটল তার ইয়ত্তা নেই। টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি কামড়াকামড়ি। আর সে কী ধেড়ে ধেড়ে কুমারী সব! ফিনকিরা মোটে পাত্তাই পেত না তাদের সঙ্গে। যাত্রীর কাঁধে হাত দিয়ে কুমারী হওয়ার জন্যে তারা বেরিয়ে যেতে লাগল মায়ের বাড়ি থেকে। অনেকের আবার রোগ হল কী সব হাতে মুখে গায়ে।

তারপর ফিনকিও বুঝতে শুরু করলে সব কিছু।

মা তাকে ফ্রক পরতে আর দিতে চায় না। সেও ফ্রক পরে বেরতে পারে না। দাদা শাড়ি এনে দিলে।

দু-একবার দু-একজন, আর ওই ডালাওয়ালাদের ঝি দু-একটা, যারা যাত্রীর হাতে জল ঢেলে দেয় তারা তাকে ডেকেও ছিল মায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কুমারী হওয়ার জন্যে। ফিনকি ছুটে বাড়ি পৌঁছে বসে পড়েছিল মার গা ঘেঁষে। সহজে আর বেরতে চাইত না ঘর থেকে।

কিন্তু নেশা আছে মায়ের বাড়ির।

ফুল-বেলপাতার পচা গন্ধ, মানুষে রভিড়, আর কয়েক আনা কাঁচা পয়সার নেশা আছে। তবে সাবধানে থাকতে হয়, ঘাপটি মেরে থাকতে হয়। নয়তো সুযোগ পেলেই গায়ে হাত পড়বে। হয় তাড়াবার জন্যে

মায়ের বাড়ি থেকে, নয়তো একটু আদর করার লোভে। মোটের ওপর গায়ে হাত পড়বেই।

তবু যেতে হবে।

এখন আর নেশায় নয়, পেশায়। এখন আর ধমকানি দেয় না মা, কিছু আনলে হাত পেতে নেয়, কিন্তু কাঁদে। অনবরত কাঁদে, লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। ফিনকির কাছে ধরা পড়বার ভয়ে ভেতরে ভেতরে কাঁদে মা। ফিনকি কিন্তু ধরতে পারে ঠিক।

সেদিন তো সে স্পষ্ট বলেই ফেললে, "মা, এ পয়সা, খারাপ পয়সা নয়। এমনি লোকে দেয়। সাধতেও যাই না আমি।"

মা শুধু চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ মেয়ের দিকে—বোবা পাঁঠা যেমন চোখে হাড়িকাঠের দিকে চেয়ে থাকে। ফিনকি আর চাইতে পারলে না মার চোখের পানে।

অনেকক্ষণ পর মা বললেন, "তুই আর বেরস নি ফিনকি। আর তুই দেখাস নি ও-মুখ কাউকে। আয়, তোতে আমাতে বিষ খাই।"

"বিষ!"

মানে, মরতে হবে। কেন? কিসের জন্যে? কী অন্যায়টা করেছে তারা যে বিষ খেয়ে মরতে যাবে? কেন?

ফুঁসিয়ে ওঠে ফিনকি ভেতরে ভেতরে। কেন? কেন? কেন? কিসের জন্যে মরতে যাবে সে? আর তার মা ই বা অনর্থক অত কাঁদবে কেন? কার কাছে কাঁদছে? কে শুনছে কান্না? কেঁদে, কান্না লুকিয়ে কেঁদে, কার মন গলাতে চায় মা?

রুক্ষ চুলগুলোয় একটা ঝাঁকি দিয়ে ফিনকি উঠে যায় খালের ধারে। মরা খালটার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে আঁস্তাকুড়ের পাশে। আঙুল মটকাতে থাকে, দাঁত দিয়ে নখ ছিঁড়তে থাকে। তার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় সামনের মরা খালটার মত। তবু ফিনকি একটা প্রশ্নেরও জবাব খুঁজে পায় না।

তারপর এক সময়ে ভাবতে শুরু করে, কোথা গেল তার বাবা? কেন গেল? কবে ফিরবে?

কংসারি হালদার মশায় মায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন মন্দিরে জল ঢালা হয়ে যাবার পর। তার মানে সেই বেলা চারটে। অনর্থক বসে দাঁড়িয়ে থাকেন মায়ের বাড়িতে, এমনি ঘুরে বেড়ান চারিদিকে। বড় একটা কথাবার্তাও বলেন না কারও সঙ্গে, আলাপ-পরিচয়ের নেইও কিছু। নিত্যকার ব্যাপার, নূতনত্ব কোথাও কিছু নেই। কয়েকটা ছোটখাট ঝগড়া, যাত্রী নিয়ে দু-একবার টানাটানি, হয়তো বা একজনের গাঁট কাটা গেল। বাস্, এর বেশী আর কিছু নয়। নূতন লোকের মুখ দেখা যায় না মায়ের বাড়িতে। যারা আসে তারাই ঘুরে ঘুরে আসে বার বার। বছরে একবার অন্তত তারা আসেই মায়ের চরণ স্পর্শ করতে। অন্য যারা আসে, তাদের আসা না-আসা দুই-ই সমান। পাঁচ সিকেয় বিয়ে, সোয়া পাঁচ আনায় মুখে ভাত, আড়াই টাকায় উপনয়ন। সবই ফুরনের ব্যাপার। দায় সারতে আসে সবাই আজকাল মায়ের বাড়ি, আর হালখাতা করাতে আসে বছরের প্রথম দিনটিতে। শ্রীশ্রীকালী মাতা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ প্রসাদাৎ· কারবার-কর্ম করবার বাসনায় গণেশ একটি কিনে খাতা বগলে করে আসে। ব্যবসা করতে গেলেই পাঁচ রকমের পাঁচটা গোলমেলে কাজ করতে হয়। আখেরে মা যেন সামালটুকু দেন। এই জন্যেই মাকে জামিন দাঁড় করানো। এই জন্যেই আসে সকলে।

কিন্তু আগে, হালদার মশায়ের বয়সকালে, ঠিক এমনটা ছিল না। খা খা, খাই খাই, দেহি দেহি সত্যিই যেন ছিল না এত। এমন যাত্রী অনেকে আসত তখন, যারা এসেই কিছু চেয়ে বসত না মার কাছে। এমনি দর্শন করতে আসত, আনন্দ করতে আসত, একটু শান্তি পাবার আশায় আসত তারা। সে সব যাত্রী নামলেই মায়ের বাড়ির হাওয়াই যেত বদলে। আজকালও লোকে দান-ধ্যান করে মায়ের বাড়িতে, কিন্তু সে একেবারে ষোল আনা পুণ্যার্জনের জন্যে দান-ধ্যান করা তীর্থস্থানে।

কিন্তু আগের তারা দানও করত না। তারা শুধু খরচ করে যেত দু হাতে মায়ের বাড়িতে। সর্ব খরচই মায়ের বাড়ির খরচ, ও সবই মায়ের পুজো দেওয়া। এই রকমই যেন ছিল তাদের ধারণা। নাও লাগাও, দশ ধামা টাকাকড়ি ছড়াও মায়ের মন্দিরের বারান্দায় ঘুরতে ঘুরতে। "হ্যাঁ, কতজন ব্রাহ্মণ আছেন হালদার মশায়? ও, আচ্ছা, সকলকে ষোল আনা করে দক্ষিণা আর একখানি করে চণ্ডী দিতে চাই, ব্যবস্থা করুন হালদার মশায়। একটু কষ্ট করে দেখুন না, এক শো আটটি কুমারী আর এক শো আটটি সধবা করা যায় কি না! হ্যাঁ হ্যাঁ, বস্ত্র দক্ষিণা তো বটেই, শাঁখা সিঁদুর আর মিষ্টি এক সরাও অমনি দিতে হবে। আর এই নিন, আজকের মায়ের ভোগরাগের যাবতীয় খরচা এই এক শো এক।"

এ সমস্ত তো ছিলই তখন মানুষের শখ। তার ওপর অন্য শখও যে ছিল না তা নয়। "ব্যবস্থা করুন, বাড়ির ব্যবস্থা করুন, সন্ধ্যের পর একটু ইয়ে, মানে—বুঝলেন না, মায়ের স্থানে একটু আমোদ আহ্লাদ না করে ফিরব কেন? আপনারা যখন রয়েছেন মাকে নিয়ে, আপনাদের একটু আমোদ ফুর্তি না করিয়ে গেলে মা কি তুষ্ট হবেন হালদার মশায়! আজ্ঞে হ্যাঁ, যাঁরা প্রবীণ, যাঁরা মান্যগণ্য, সকলকে বলা চাই বইকি।"

রাতে ভাল করে আলো জ্বলত কোনও বাড়ির ঢালাও বৈঠকখানায়, ঘুঙুর তবলা সারেঙ্গীর সঙ্গে তাল ঠুকে চেঁচাত সবাই। সবই হত, কিন্তু সে ওই মায়ের সন্তুষ্টির জন্যে। মায়ের দামাল ছেলের কেউ এলে তবে হত। লজ্জার কী আছে, মায়ের কাছে আবার লুকোচুরির আছে কী! হুঁ, যত সব—

কংসারি হালদার মশায় হাঁড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভাবতে থাকেন, তখনকার পাঁঠাগুলোও ঠিক এখনকার পাঁঠার মত এমন মরণাপন্ন পাঁঠা ছিল না। এখনকার পাঁঠাকে হাঁড়িকাঠে ফেললে যে জাতের বীভৎস চেঁচান চেঁচিয়ে মরে তখনকার পাঁঠার চেঁচানি এতটা কদর্য ছিল না। এগুলোর কাতরানি, বাঁচার জন্যে আকুলি-বিকুলি, দেখলে দয়া হয় না,

মন খারাপ হয় না। শুধু রাগ হয়। মনে হয়, এদের বেঁচে থাকার দায় থেকে এগুলোকে নিষ্কৃতি দেওয়াটাই সব থেকে বড় কাজ।

কংসারি হালদার মশায় কোঁচার খুঁট গায়ে জড়িয়ে মায়ের বাড়ির চারিদিকে হাঁটেন। হাঁটেন আর মনে মনে মিলিয়ে দেখেন। না, সবই ঠিক চলছে। কোথাও বদলায় নি কিছু। তবে হালদার মশায়দের যজমানরা আর নেই। ডালাধরাদের যজমান যথেষ্ট। সোয়া পাঁচ আনা, পাঁচ সিকে, বড় জোর পাঁচ টাকা খরচা করার মত বুকের পাটা নিয়ে আসে সকলে মায়ের বাড়ি। আনন্দ স্ফূর্তি যে করে না, তা নয়। তবে তাও সারে ওই আট আনা এক টাকার মধ্যে। ডালাধরাই সে ব্যবস্থা করে দেয় ওই ওধারে খালধারে ছোট ছোট টিনের খুপরিতে। যেমন পুজো তেমনি সব দক্ষিণে। ভালই হয়েছে, হালদার মশায়দের বংশধরেরা উকিল ডাক্তার হয়ে মায়ের বাড়ির দিকে পেছন ফিরেছে। অনেকে তো চাকরি নিয়ে চলেই গেছে বিদেশে। ভালই হয়েছে। উঞ্ছবৃত্তির হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে বেঁচেছে।

মিছরি-বংশও তাই করছে। মিশ্র থেকে মিশরি, মিশরি থেকে একেবারে মিছরি হয়ে দাঁড়িয়েছে বেচারারা। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ওরা, মায়ের অঙ্গ স্পর্শ করবার অধিকার নিয়ে ওদের পূর্বপুরুষ মায়ের সেবায় লাগেন। উচ্চস্তরের সাধক না হলে সে অধিকার পেলেন কী করে তিনি! কিন্তু তারপর বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে পৌঁছল! সাধনা শুধু দাঁড়িয়েছে এখন ট্যাঁকের। এবার ট্যাঁকও শুকিয়ে শ্মশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ করছে, ছেলেপুলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে অন্য রুজি-রোজগারের ধান্দায় পাঠাচ্ছে। বেশ করছে, কী হবে এই হতচ্ছাড়াদের সঙ্গে খেয়োখেয়ি করে! তাতে পোষায় কি কারও! শুধু শুধু জাত-ভিখারী হয়ে জীবন কাটানো। সব শুকিয়ে গেছে, যাচ্ছে, আরও যাবে। একেবারে ওই মরা খালটার মত মরে যাবে। ওই আদিগঙ্গার মত। আদিগঙ্গায় লোকে আগে আদ্যশ্রাদ্ধ করত। এখন আদিগঙ্গারই আদ্যশ্রাদ্ধ হয়ে গেল। হালদার মশায়ের চোখের সামনে দেখতে দেখতে এমনটা হয়ে গেল। বেশ হল।

কিন্তু এবার তাড়াতাড়ি করতে হয়। সন্ধ্যের আগেই বসতে হবে ভাতের থালার সামনে হালদার মশায়কে। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাবে তাঁর পৃথিবী আঁধার হয়ে। তার আগেই শেষ করা চাই দিনের কাজ। দিনের কাজ মানে ওই একবার ভাতের থালার সামনে বসা। আঃ, এটুকুর হাত থেকেও যদি নিষ্কৃতি পাওয়া যেত!

হালদার মশায় ফিরে গেলেন বাড়িতে নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন তিনি। বাড়ির মানুষরা তাঁর নিজের মানুষ, ছেলে বউ নাতি নাতনী সব তাঁর নিজের। লোকে বলে কংসারি হালদার মশায়ের বাড়ি, এখনও তাই বলে। লোকে যেমন বলে কংসারি হালদার মশায়ের পালা। পালা কিন্তু সত্যিই তাঁর নয়, যে করে তার। যে কিনে নেয় তারই পালা। তিনি শুধু মায়ের ভোগটা পুজোটা চালান। কেউ যদি পালা নাও কেনে তবু তিনি চালাবেন। কী করে চালাবেন তা শুধু মা জানবে আর তিনি জানবেন, আর কেউ জানবে না।

ছেলেরা বড় বড় চাকরি করে। বউমায়েরা ভাল বংশের মেয়ে। তাঁরা মায়ের বাড়ির মহাপ্রসাদ নিয়ে মাথায় ঠেকান। তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও ওসব ছুঁতে দেন না। বলেন, "ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে এক ধারে সরিয়ে রাখ ও সমস্ত, কাল ঝি এসে গঙ্গায় দিয়ে আসবে।" পচা খালের জল দিয়ে রান্না হয় কিনা! কে বলতে পারে, কী রোগের বীজ এসে ঢুকবে বাড়িতে ওই মহাপ্রসাদের সঙ্গে!

মাংস, তাও কালীবাড়ির বলির মাংস অচল। বউমায়েরা জানেন, ও সব পাঁঠার হেন রোগ নেই যা নেই। তার চেয়ে বাজার থেকে ছাপ-দেওয়া খাসির মাংস এনে খাও। নয়তো, যা সব থেকে ভাল ব্যবস্থা, তা হচ্ছে ছুটিছাটার দিন সিনেমা-টিনেমা দেখে ভাল হোটেল থেকে মাংস খেয়ে বাড়ি ফেরা। রোগ হওয়ার ভয় নেই, হাঙ্গামাও নেই কিছু। তাই বাড়িতে মাংসটা হয়ই না বড়-একটা। যে ছেলে যে দিন তার বউ ছেলে নিয়ে বেড়াতে যায়, সে ভাল হোটেল থেকে ভাল মাংস খাইয়ে আনে তাদের।

হালদার মশায় খেতে বসেন। বাড়ির সকলের খাওয়াদাওয়া ঘণ্টা পাঁচ-ছয় আগে চুকে গেছে। বিকেলের চা জলখাবার খাওয়াও শেষ। হালদার মশায় খেতে বসেন। তাঁর ছেলেরা বউমায়েরা খুবই কড়া নজর রাখেন তাঁর খাওয়াদাওয়ার ওপর। বামুনের ওপর হুকুম দেওয়া আছে, "খবরদার, তিনটের পর থেকেই উনুন ধরিয়ে জল চাপিয়ে বসে থাকবে ঠাকুর। আতপ কটি একেবারে বেশ করে ধুয়ে সামনে নিয়ে বসে থাকবে। আর নজর রাখবে, বাবা আসছেন দেখলেই দেবে ফুটন্ত জলের মধ্যে চাল ফেলে। পাঁচ মিনিটেই হয়ে যাবে। খবরদার, কিছুতেই যেন ঠাণ্ডা না হয়ে যায়। খুব সাবধান!"

খুব সাবধানের গরম আতপ চালের ভাত, একটু ঘি আর ওই ভাতের মধ্যে যা সিদ্ধ হয় তাই, খুব সাবধানেই তাঁর সামনে নামিয়ে দেওয়া হয়। হালদার মশায় খান।

দুধ খান তিনি রাত্রে, ওটা তাঁর ঘরে চাপা দেওয়া থাকে। গরম থাকে না, তা না থাকুক, হালদার মশায়ের ঠাণ্ডা দুধ খেতে কষ্ট হয় না। রাতে ওই দুধটুকুই খান তিনি, আর কিছু নয়।

এক সময় উনি নাকি খুবই খেয়েছেন! খেতেও পারতেন খুব। লোকে বলে, আস্ত একটা পাঁঠা নাকি খেতে পারতেন উনি! নিজেও খেতেন যেমন, খাওয়াতেনও তেমনি লোককে। হালদার-বাড়িতে নাকি রোজই যজ্ঞি লেগে থাকত! দৈত্যারি হালদার মশায়ের আমলে প্রতিটি পালায় তিনি কালীঘাটসুদ্ধ মানুষকে প্রসাদ নেওয়ার নেমন্তন্ন করতেন। কেউ না গেলে রাগ করতেন, ঝগড়া করতেন, এমন কি মারও দিতেন। ছেলে কংসারি যদিও অতটা পারতেন না, তবু হেন দিন নেই যে দশ-বিশ জনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ঢোকেন নি তিনি খাওয়ার সময়। খুঁজে পেতে ধরে আনতেন। "আরে বাব্বা, কালীঘাটে এসেছ কি হোটেলে খাবার জন্যে? এস আমার সঙ্গে, যা হয় দু মুঠো মুখে দিয়ে যাও। মায়ের অন্নছত্র খোলাই আছে। আরে বাব্বা, হালদার-গুষ্টি থাকতে মায়ের স্থানে কেউ উপোস করে থাকবে নাকি?"

মায়ের স্থানে কেউ উপোস করে থাকতে পারে না।

হালদাররা থাকতে মায়ের স্থানে এসে কেউ যেন উপোস করে না ফিরে যায়।

এতে মায়ের অপমান, কেউ উপোস করে থাকলে মায়ের স্থানে মাও উপোসী থাকবে যে। সুতরাং মাকে খাওয়াতে গেলে হালদারদের ওদিকেও নজর রাখতে হবে। সেই জন্যেই হালদাররা কালীঘাটের হালদার।

এই সমস্তই হালদার-গুষ্টির ছেলেরা জানত। তাদের বউয়েরা তাই হাঁড়ি ঠেলাটাকে হাঁড়িঠেলা বলে মনে করত না। সব বাড়িতেই মায়ের ভোগ হত। যা রান্না হত, সবই বাড়ির গিন্নী মনে মনে মাকে নিবেদন করে দিতেন। কিংবা হুটি মহাপ্রসাদ নিয়ে এসে ছিটিযে মিশিয়ে দিতেন বাড়িতে রান্না ভাত-তরকারির সঙ্গে। বাস্, খাও এবার মায়ের প্রসাদ। সবাই খাও, কর্তারা ছেলেরা যাদের সঙ্গে নিযে বাড়ি ঢুকবে তারা তো খাবেই। কিছুতেই কম হবে নাকি মায়ের প্রসাদ! সেটি হবার জো নেই হালদার-বাড়িতে। কারণ কালীঘাটেব হালদার-বাড়িতে লোকে খাবেই।

এই ছিল দস্তুব। এইটুকুই ছিল হালদারদের অভিমান। এবই নাম ছিল মাযের সেবা চালানো। কেউ মায়েব বাড়ি এসে উপোসী থেকে ফিরে না যায়, সর্বনাশ, তা হলে মাও উপোসী থাকবেন যে!

কিন্তু সব শুকিয়ে গেছে। ওই আদিগঙ্গাটার মত সব শুকিয়ে গেছে। এমন কি মায়ের বাড়িতে যে পাঁঠা এখন চেঁচায়, তার চেঁচানিটা পর্যন্ত বিষিয়ে একেবারে এমন জঘন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ওটা উঠিয়ে দিলেও মন্দ হয় না।

হালদার মশায় আতপ চালের ভাতেভাত মুখে তোলেন। কিন্তু গিলতে পারেন না সহজে। কেমন যেন গলার কাছে সব আটকে যায়।

আটকে যায় আরও অনেক-কিছু সেই সঙ্গে। ভাবতে গিয়ে ভাবনাও যায় আটকে। রেষারেষি করে পাল্লা দিয়ে পালা চালানো

যেমন আটকে গেছে। কোন্ হালদার কতগুলো মানুষকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেছে ভাত খাওয়াবার জন্যে, এ আলোচনা যেমন আটকে গেছে হঠাৎ একদিন। কোন্ হালদার কবে কাকে সোজা হুকুম দিয়েছে, "নাও ঠাকুর, এখানেই থেকে যাও, মায়ের দরজায় দু মুঠো জুটবেই, মা কাউকে উপোসী রাখেন না।" এ সমস্ত হিসেবনিকেশ করাও একেবারে উঠে গেছে কালীঘাটের কালীর ত্রিসীমানা থেকে। কংসারি হালদার মশায় খাওয়ার পরে অন্ধকার ঘরে আস্তে আস্তে হাঁটেন আর ভাবেন। ভাবতে গিয়ে তাঁর ভাবনাও যায় আটকে। সবই আটকে যায়।

তার মানে—

হালদার মশায় থমকে দাঁড়ান ঘরের মাঝখানে। দাঁড়িয়ে আবার নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করেন, তার মানে ?

উত্তরটা খুঁজে পান। হাঁ হাঁ, ঠিকই তো! একেবারে ঠিক। এতগুলো লোকের এ ভাবে আজ ভিখিরী হয়ে যাবার জন্যে কে দায়ী ? কারা দায়ী ?

দায়ী হালদাররা, তাঁদের পূর্বপুরুষেরাই দায়ী এতবড় সর্বনাশটা ঘটার জন্যে। হালদার-বাড়ির ভাত দু বেলা দু মুঠো খাও, আর যা পার, মায়ের বাড়ি চেটে যা পাও নিয়ে দেশে পাঠাও। তোমাদের মাগ ছেলে বাঁচুক। নয়তো তোমরা ব্রাহ্মণসন্তানরা করবে কী !

এ আশ্বাস কারা দিয়েছিল এই হাবাতে গুষ্টির পূর্বপুরুষদের ? হালদাররা, মায়ের খাস সেবায়েতরা, যারা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করত, মা কাউকে উপোসী রাখেন না। তাই তখন সেই দৈত্যারি হালদার মশায়ের ঠাকুরদার আমলের আগের আমল থেকে কালীঘাটে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে কেউ ফিরে যায় নি। তাই তখন সেই সব মহা অভিমানী হালদারদের মধ্যে রেষারেষি ছিল, কে কটা মানুষকে বসাতে পারল কালীঘাটে তাই নিয়ে। তাই তখন হালদার-বাড়ির অন্নছত্র হরদম থাকত খোলা। আর মায়ের মুখটাও দিনরাত অমন আঁধার হয়ে থাকত না।

আরও আছে, অনেক হিসেবের গরমিল আছে, যা তখনকার হালদার মশায়রা করে গেছেন। স্রেফ এই গর্বেই তাঁরা ধরাকে সরাজ্ঞান করতেন যে, তাঁরা মায়ের সেবায়েত। এই দেমাকেই যাকে যা খুশি হুকুম দিয়ে বসতেন মায়ের নামে। এখন তাঁদের বংশধরেরা দায়িত্ব এড়াবার জন্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

কিংবা হয়তো কারও মনেই হয় না একবার পূর্বপুরুষদের কথা।

যেমন কংসারি হালদার মশায় নিজেই নিজে স্মরণ করতে ভয় পান, কতগুলো মানুষকে তিনি খামকা ভরসা দিয়ে ধরে রেখেছেন মায়ের বাড়ির মাটি চেটে খাবার জন্যে! ভাগ্যে তারাও ভুলে গেছে তাঁর কথা। নয়তো—

নয়তো হালদার মশায়কে দিনের আলোতেও প্যাঁচার মত মুখ লুকিয়ে থাকতে হত। তা ছাড়া আর কী উপায় ছিল তাঁর!

তাঁর বাড়িতে, তিনি বেঁচে থাকতে, যদি কেউ এসে দাঁড়ায় ছুপুরবেলা ছুটি প্রসাদের জন্যে, কী করতে পারেন তিনি? বউমায়েদের সে কথা বলতে যাবেন না কি!

হা-হা-হা-হা! হালদার মশায় নিঃশব্দে হা-হা-হা-হা হাসতে লাগলেন অনেকক্ষণ। বললে যে কী ফল দাঁড়াবে তাই ভেবে হাসতে লাগলেন মনে মনে। মনে মনে অট্টহাস্য হাসতে লাগলেন। যেমন একদা মায়ের নাটমন্দির ফাটিয়ে হাসতেন তাঁরা হাসার মত একটা কিছু ঘটলে।

তখন হাসার মত সহজে কিছু ঘটত না তাই লোকে হাসতে জানত। এখন হাসার মত ব্যাপার আকছার এত ঘটছে যে লোকে হাসতেই ভুলে গেছে। শুধু কান্না, কান্নায় কান্নায় এমন ভরে গেছে ছুনিয়াটা যে মায়ের মন্দিরের চুড়ো ছাড়িয়ে উঠেছে কান্নার পাহাড়।

সে হল ওই বলির পশুর কান্না। ও কান্না শুনে হালদার মশায়ের প্রাণ কাঁপে না।

তেমন তেমন দিনে মায়ের বাড়িতে মেয়েমানুষ-পুলিস আসে। খাকী পরে আসে না, সাদা কোট-প্যাণ্ট পরে আসে। যেমন ওই রাস্তার সার্জেণ্টদের পোশাক। নাটমন্দির থেকে মায়ের মন্দির পর্যন্ত পড়ে একখানা ছোট্ট হাত চারেক লম্বা কাঠের সাঁকো। মেয়ে-পুলিসরা সেই সাঁকোর উপর জটলা করে। মেয়েযাত্রীদের সে সব দিনে মন্দিরের ভেতর ঢুকতে দেওয়া হয় না। নাটমন্দির থেকে সেই কাঠের সাঁকো দিয়ে মায়ের সামনের দরজার সামনে এসে মেয়েরা মাকে দর্শন করে যায়। সে সব দিনে মায়ের বাড়িতে ঢোকার বেরবার পথও মেয়ে পুরুষের জন্যে আলাদা আলাদা। মেয়ে-পুলিস আসে মেয়েদের রক্ষা করবার জন্যে। কাজেই মা কালীর আর কাউকে রক্ষা করার দায়িত্ব থাকে না। হালদার মশায়রাও সে সমস্ত বিশেষ দিনে পরম নিশ্চিন্ত থাকেন।

কিন্তু কপালে দুর্বিপাক থাকলে বখেড়া বাধতে কতক্ষণ! বলা নেই কওয়া নেই, একটু খবর পর্যন্ত দেওয়া নেই, হঠাৎ দুম করে এসে উপস্থিত হল জলজ্যান্ত দুর্বিপাক। সেই সদানন্দ রোডের ওখানে গাড়ি রাখতে হয়েছে, পুলিস একখানি গাড়িও এধারে আসতে দিচ্ছে না। তা তাই সই, হেঁটে এসেছে সকলে এতটা পথ গাড়ি ওখানে রেখে। এ সমস্ত হাঙ্গামার দরকারই হত না যদি একটু সংবাদ দিয়ে আসা হত। থানায় বলে ব্যবস্থা করে হালদার মশায় ওই গাড়ি এখানে আনাতেন। মায়ের বাড়ির পাশেই আসত গাড়ি যেমন অন্য দিনে আসে। খামকা এই কষ্ট করা।

হালদার মশায় গজগজ করতে লাগলেন।

যজমানরা কিন্তু মহাখুশী। এই ভিড়ে হালদার মশায়কে খুঁজে বার করতে পেরেছেন তাঁরা, এতেই যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছেন। গিন্নীটি অর্থাৎ এখনও যিনি খোদ রানীমা, তিনি প্রণাম করালেন সকলকে রাস্তার ওপরেই।

"নাও, নাও, কর, সকলে প্রণাম কর ঠাকুরমশাইকে। তীর্থগুরু আমাদের বংশের, আমাদের সাতপুরুষের ভালমন্দের জন্যে এঁরাই দায়ী। *ঠাকুরমশাই, এই এইটি হল বউ,' হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল মায়ের ইচ্ছেয়।* আপনাকে খবর দেওয়ার সময় পেলাম না। তাই বিয়ের পরই ছুটে আসছি মায়ের স্থানে। মায়ের সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে মায়ের প্রসাদী সিঁদুর দেবেন এর কপালে, মায়ের পায়ে ছোঁয়ানো মোহর বেঁধে দেবেন আঁচলে, যেমন আপনার বাবা আমার কপালে সিঁদুর দিয়ে আঁচলে মায়ের প্রসাদী বেঁধে দিয়েছিলেন। তারপর বউ নিয়ে ঘরে ফিরব। সেই প্রসাদী মোহর, বউ লক্ষ্মীর চুপড়িতে নিজে হাতে তুলবে, তবে এ বংশের বউগিরি করা আরম্ভ হবে। জানলে বউমা, এখন ইনি যা করাবেন সেইটুকুই আসল ব্যাপার। এই নিন ঠাকুরমশাই, বউ এনে খাড়া করে দিলুম আপনার কাছে। যা যা করবার করুন এবার। আমার দায়িত্ব এতদিনে শেষ হল।"

কংসারি হালদার একটা ঢোঁক গিললেন জোর করে। মুখ তুলে একবার চেয়ে দেখলেন মায়ের মন্দিরের চুড়োটা। নীচে নজর নামাতেই দেখতে পেলেন ঘিরে দাঁড়িয়েছে সকলে। জ্বলছে সকলের খোঁদলে-বসা চোখগুলো, গলা উঁচু করে ডিঙি মেরে দেখছে অনেকে। হাড়-হ্যাংলার ঝাড় সব, ভাবছে মারলে আজ মজা কংসারি হালদারই। কপাল বুঝি ফিরে গেল ব্যাটা বুড়ো শকুনের!

যজমানদের শকুনের চাউনি থেকে বাঁচবার জন্যে হালদার মশাই তাড়াতাড়ি সরাতে চাইলেন সেখান থেকে। হালদারপাড়া লেনের মুখে একখানা বাড়ির দোতলা ঘরে তিনি যাত্রী তোলেন। ও-বাড়ির মালিক তাঁর মান রাখতে দরকার হলে খুলে দেয় ঘরখানা এক-আধ ঘণ্টার জন্যে। সেই ঘরেই নিয়ে যেতে চাইলেন সকলকে। কিন্তু ওঁরা একেবারে ধুলো-পায়েই দর্শন করবেন মাকে। তাই নাকি করা নিয়ম ওঁদের বংশের! মায়ের স্থানে এসে আগে মায়ের চরণ স্পর্শ করে তবে অন্য কাজ।

কিন্তু চরণদর্শন, চরণস্পর্শ! তাই তো!

হালদার মশায়ের ঘাড়ের শিরগুলো একটু টানটান হয়ে উঠল।

অন্য সকলে চেয়ে রয়েছে তাঁর দিকে। অর্থাৎ দেখতে চায়, কেমন করে কংসারি হালদার তাঁর বড়লোক যজমানকে এমন দিনে মায়ের চরণ স্পর্শ করাবে।

মেয়েদের যে ঢুকতেই দেয় না মন্দিরের মধ্যে। তাই তো!

আর একবার মায়ের মন্দিরের চুড়োর দিকে তাকালেন হালদার মশায়। তারপর বললেন, "বেশ, তবে তাই হোক। চল, এগিয়ে চল সকলে। হ্যাঁ, ঠিক আমার পেছনে এস। সাবধানে এস। খুব সাবধানে এস সকলে, এত গয়নাগাঁটিসুদ্ধ বউরানীকে আজকের দিনে না আনলেই ভাল হত মা। আচ্ছা, যা করেন মা, এস তোমরা।"

হালদার মশায় পৌঁছলেন সকলকে নিয়ে উত্তর-পুব কোণের দরজাটায়। তিনি ভাল করেই জানতেন, সে দরজায় মেয়েদের যাওয়া-আসা নিষেধ। শুধু-পুরুষরা যাবে-আসবে সে দরজা দিয়ে। মেয়েরা যাওয়া-আসা করছে পুব দিকের মাঝের দরজা দিয়ে, ওখানে মেয়ে-পুলিস পাহারা দিচ্ছে। হালদার মশায় ওঁদের ওখানে দাঁড় করিয়ে ছুটলেন ব্যবস্থা করতে।

ব্যবস্থা হতে মিনিট পাঁচেকও লাগল না। হালদার মশায়ের আর এক সম্ভ্রান্ত যজমান, পুলিসের একজন হোমরাচোমরা কর্তা, নিজে এসে কোণের দরজা দিয়ে মেয়েদের ঢোকার হুকুম দিলেন এবং নিজে ভেতরে গিয়ে ভোগ-রান্নার রান্নাঘরের সামনে দিয়ে সকলকে উঠিয়ে দিলেন পুলের ওপর। মন্দিরের মধ্যে যারা ঢুকেছে তারা বেরলেই যাতে হালদার মশায় ঢুকতে পারেন তাঁর যজমানদের নিয়ে, সে ব্যবস্থা করে গেলেন। নিজেদের বানানো ব্যবস্থা নিজেরা ভাঙবার ব্যবস্থা করলেন। হালদার মশায় দেখাবেনই তাঁর যজমানদের যে, কংসারি হালদার এখনও বেঁচে রয়েছেন। কংসারি হালদার বেঁচে থাকতে তাঁর যজমান মায়ের চরণস্পর্শ করতে পারবে না! আচ্ছা, এবার দেখুক সকলে চোখ মেলে কংসারি হালদার কী পারেন না-পারেন!

হালদার মশায় গলা থেকে কোঁচার খুঁট নামিয়ে কোমরে বেঁধে নিলেন শক্ত করে। ডান দিকে তাকালেন একবার। বাঁশ বেঁধে আটকে রাখা হয়েছে মানুষগুলোকে মন্দিরের বারান্দায়। দম প্রায় আটকে এসেছে সকলের, চোখগুলো ফেটে বেরিয়ে আসার মত হয়েছে চাপের চোটে। মন্দিরের ভেতরে যাবার দরজাটা পরিষ্কার, ভেতরে ঢোকানো হয়েছে মানুষ। যা ঢোকা উচিত, তার অন্তত তিন গুণ বেশী ঢোকানো হয়েছে। এখন তারা বেরলেই হয়। একেবারে দরজার মুখে দাঁড় করালেন সকলকে হালদার মশায়।

ঝন ঝন ঝনাৎ, শিকল আছড়াতে লাগল দরজার গায়ে লাল-পাগড়ি-ওয়ালা ঃ "বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস, বহার আও যাও।"

আরম্ভ হল বেরনো। দরজার এক ধারে সরিয়ে দাঁড় করালেন হালদার মশায় যজমানদের। নতুন বউ, তার শাশুড়ী, স্বামী আর দুটি মেয়ে—একজন বিবাহিতা, একটি বোধ হয় বিধবা। হালদার মশায় ভাল করে তাদের বুঝিয়ে দিলেন কী করতে হবে। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া-টেওয়া কিছুই আজ হবার জো নেই, টপ করে একবার চরণস্পর্শ করে ফিরে আসা, বাস্। হালদার মশায় পরে এসে পুজো করে যাবেন।

তাঁরা বুঝলেন বোধ হয়। নতুন বউটির স্বামী সভয়ে বললেন তাঁর মাকে, "তা হলে না হয় আজ ভেতরে নাই বা যাওয়া হল—"

তাঁর কথাটা শেষও হল না, পেছনের চাপে সকলে আচমকা মন্দিরের দরজা পার হয়ে গেলেন।

হালদার মশায় দু হাতে ধরলেন বউটির আর তার শাশুড়ীর কব্জি দুখানা। মুহূর্তের মধ্যে সিঁড়ি কটা দিয়ে নামিয়ে লোহার বেড়া পার করালেন মায়ের পেছনের ছোট্ট দরজা দিয়ে। তার পরই নিচু হতে হবে ; গুঁড়ি মেরে বাঁশের নীচে দিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে মায়ের সামনে ; সেটুকুও করালেন। দাঁড় করিয়ে দিলেন নতুন বউ আর শাশুড়ীকে মায়ের সামনে। মিছরিদের তিন-চারটি জোয়ান ছেলে রয়েছে মায়ের সামনে। হালদার মশায়কে দেখে আর তাঁর যজমানদের দেখে তারা

চক্ষের নিমেষে অবস্থাটা বুঝে ফেললে। এমন দিনে সাধ্য আছে কার, সাহসই বা হত কার, মেয়েদের মন্দিরের মধ্যে ঢোকাবার !

কিন্তু হালদার মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা প্রমাদ গনল। এই বয়েসে ভয়ানক সাহস করেছেন তিনি, নিজে একেবারে হলদে হয়ে গেছেন ওদের ভেতরে আনতেই। কেমন যেন মুখের অবস্থাটা হয়ে উঠেছে হালদার মশায়ের। এখন মন্দির থেকে বার করা যায় কী করে এঁদের !

মিছরিরা চোখে চোখে কথা কয়। চক্ষের নিমেষে মায়ের পায়ে হাত ঠেকিয়ে দিলে বউটির আর তার শাশুড়ীর। মায়ের কপাল থেকে সিঁদুর নিয়ে লেপটে দিলে বউটির কপালে। কী একটা দিতে গেল বউটি মায়ের পায়ে, সেটাও মায়ের খাঁড়া-ধরা হাতে ঠেকিয়ে ধরিয়ে দিলে বউটির হাতে। পর-মুহূর্তেই ওদের ঘাড় ধরে মাথা নিচু করিয়ে বাঁশ পার করে দিলে। দুজন মিছরি প্রাণপণে লড়তে লাগল সিঁড়ি কটা উঠিয়ে দরজা পার করে দেবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত হল তাদের জয়, দরজার বাইরে ছিটকে এসে পড়লেন হালদার মশায়, তখনও তিনি বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছেন শাশুড়ী-বউয়ের কব্জি দুখানা।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে লাগল মিনিট দুয়েক সময়। বউটির কথা বলারও সামর্থ্য নেই তখন, তার শাশুড়ী শুধু বলতে পারলেন, "ওরা কোথা গেল, ওরা যে—"

তাঁর কথাটা শেষ হল না।

হালদার মশায় টলে পড়লেন তাঁদের গায়ের ওপর।

ভয়ঙ্কর কাণ্ড একটা ঘটতে গিয়েও ঘটতে পেল না। টনক নড়ে উঠল সকলের। ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল হালদার-গুষ্টির যে যেখানে ছিল সবাই। ঘিরে দাঁড়াল পুলিস। তারপর কে কখন কী ভাবে যে ওঁদের সকলকে মায়ের বাড়ির বাইরে এনে ফেললে তা হালদার মশায় জানতেও পারলেন না।

হালদারপাড়া লেনের মুখের সেই দোতলা ঘরেই ওঁদের তুলে দিয়ে সবাই চলে গেল। সেদিন তখন সময় নষ্ট করার মত সময় নেই কারও। সুতরাং যে যতটুকু করতে পারল তাই যথেষ্ট।

হালদার মশায়ও সামলে উঠেছেন ততক্ষণে। মহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন তিনি। এ ভাবে যে তাঁর মাথাটা তাঁর সঙ্গে হঠাৎ নিমকহারামি করে বসবে, তা তিনি বুঝতে পারেন নি। যজমানরাও *ভয়ানক মনমরা হয়ে গেছে। এমন দিনে মন্দিরের মধ্যে যাওয়ার জন্যে* আবদার করাটা সত্যিই ঠিক হয় নি।

তবু চরণস্পর্শ করা হয়েছে ঠিক। মায়ের কপালের সিঁদুর নতুন বউয়ের কপালময় লেপে রয়েছে। বউটি তখনও মুঠির মধ্যে ধরে আছে মায়ের খাঁড়া-ধরা-হাতে-ছোঁয়ানো সোনার মোহরটি। সুতরাং সবই ঠিকঠাক হয়ে গেছে। হালদার মশায় চেয়ে দেখলেন যজমানদের দিকে। দামী কাপড়-জামাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ওঁরা পরম তৃপ্ত। তৃপ্তির আলোয় জ্বলছে ওঁদের মুখ চোখ। গিন্নী বার বার বলছেন, "দেখ বউমা, ভাল করে চিনে নাও। এঁরা আমাদের তীর্থগুরু। তোমার শ্বশুর-বংশের ভালমন্দের জন্যে এঁরাই দায়ী। ইনি না থাকলে আর কার সাধ্য ছিল বল, আজকের দিনে আমাদের মায়ের চরণস্পর্শ করাবার! আর কে পারত এ কাজ—"

বউমাটি তখন মাথা নিচু করে এক হাতে দেখে নিচ্ছে তার কানের মাথার গলার গয়নাগাঁটিগুলো। হঠাৎ একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল। আর্তনাদ ঠিক নয়, কেমন যেন একটা বোবা গোঙানি!

চমকে উঠল সকলে। ঘিরে দাঁড়াল বউটিকে। পর-মুহূর্তেই হালদার মশায় লাফিয়ে উঠলেন আবার।

"কী হল! কী গেছে?"

গেছে একটি মহামূল্য হার বউয়ের গলা থেকে। তাতে সোনা যা আছে তার জন্যে মাথা ঘামাবার কিচ্ছু নেই। কিন্তু আছে একখানি লকেট সেই হারের সঙ্গে। লকেটখানির মূল্য অপরিসীম। সেখানা হারালে কিছুতেই চলবে না। সেই লকেটের মধ্যে আছে এমন জিনিস, যা এই বংশের প্রথম বউকে আগাগোড়া গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হয় শ্বশুরবাড়িতে পা দিয়েই। তারপর তার ছেলের বউ এলে তার গলায়

ঝুলিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্তি। নয়তো ভয়ানক একটা কিছু অমঙ্গল ঘটবেই বংশে।

হালদার মশায় আর শুনলেন না লকেটের গুণব্যাখ্যান। যাই থাক্ সেই লকেটে, *লকেট কিন্তু পাওয়া চাই।*

ছুটলেন আবার তিনি। তরতর করে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। ওঁরা বাধা দেবার ফুরসতই পেলেন না। বাধা দেবার মত অবস্থাও ছিল না তখন ওঁদের, এতটা হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন সকলে লকেট হারিয়ে। সকলে নেমে গেলেন রাস্তায় হালদার মশায়ের পিছু পিছু।

আবার সেই পুলিসের কর্তাকে ধরলেন গিয়ে হালদার মশায়। জড়ো হল হালদার-গুষ্টির কর্তা-ব্যক্তিরা। কী করা প্রয়োজন ঠিক হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। বন্ধ কর মায়ের বাড়ির সব কটা দরজা। চোখা চোখা পুলিসের লোক দাঁড়াক সব দরজায়। দেখে দেখে লোক ছাড়ুক। সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে ছাড়বে না কিছুতে। এমন কি তেমন কোনও মেয়ে দেখলেও তাকে খানাতল্লাশ না করে ছাড়বে না। হারটা ছিঁড়েই নেওয়া হয়েছে গলা থেকে। দাগও দেখা গেল গলায়। ছিঁড়ে না নিলে ও হার নেওয়াই যাবে না। হারটা পড়তেই পারে না বউয়ের মাথা গলে। খোলবার বন্ধ করবার ব্যবস্থাও ছিল না হারে।

অতএব বাজাও বাঁশী। এখনও যদি চোর ভেতরে থাকে তো আটকা পড়বেই। বাজাও বাঁশী।

পুলিসের বাঁশী বাজতে শুরু হল। একটা বাজতেই বেজে উঠল একশোটা। বন্ধ হল মায়ের বাড়ির সব কটা দরজা। দেখে দেখে লোক ছাড়া আরম্ভ হল। ঁদে পুলিস অফিসার কয়েকজন ঢুকলেন ওঁদের নিয়ে মায়ের বাড়িতে।

অসম্ভব। এ একেবারে অসম্ভব আশা। সৃষ্টিসুদ্ধ মানুষ জমেছে মায়ের বাড়ির মধ্যে। এর ভেতর থেকে চোর খুঁজে বার করার আশা করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন হালদার মশায়ের যজমান-গিন্নী মায়ের উঠনে।

গর্জন করতে লাগল পুলিসের চোঙা ঃ

"আপনারা ব্যস্ত হবেন না। দয়া করে একে একে বেরিয়ে যাবেন মায়ের বাড়ি থেকে। আপনারা যদি ব্যস্ত না হন আর একটু সাহায্য করেন তা হলে একজন দুর্দান্ত চোরকে এখনই আমরা ধরতে পারব। সে আছে এখন এখানেই, আপনারা দয়া করে বিরক্ত হবেন না। আপনাদের এই কষ্টটুকু দিতে হচ্ছে বলে আমরা লজ্জিত। কিন্তু আজকের দিনে যে বদমাশ মায়ের বাড়ির মধ্যে মেয়েদের গা থেকে গয়না ছিনিয়ে নিয়েছে, তাকে ধরা চাই। সুতরাং দয়া করে আপনারা একে একে শান্তভাবে বেরিয়ে যান। পুলিস ভাল লোককে আটকাবে না, ভাল লোককে অনর্থক কষ্ট দেবে না। আপনারা সাহায্য করুন।"

বার বার বলা হতে লাগল এক কথা চোঙায়। মায়ের বাড়ির ভেতরে বাইরে গণ্ডা গণ্ডা চোঙা খাটিয়েছে পুলিস। আকাশ-বাতাস থরথর করে কাঁপতে লাগল পুলিসের গর্জনে।

বৃথা আশা।

আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। এক এক মিনিট যেন এক এক ঘণ্টা মনে হতে লাগল হালদার মশায়ের। তিনি দুমদুম করে মায়ের মন্দিরের গায়ে মাথা কোটা শুরু করলেন।

আচম্বিতে হৈ হৈ ধর্ ধর্ মার্ মার্ রোল উঠল মন্দিরের ওধার থেকে। তীরবেগে একটা ছোঁড়া ছুটে এল মন্দিরের পশ্চিম দিকের বারান্দার ওপর দিয়ে। চরণামৃত নেওয়ার নর্দমার ওপর পর্যন্ত এসেই রেলিং টপকে ঝাঁপ দিলে নীচে। নামল একেবারে ফিনকির গায়ের ওপর। হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফিনকি। পর-মুহূর্তেই তার মনে হল কী যেন একটা সড়াৎ করে নেমে গেল তার পিঠ বেয়ে জামার নীচে দিয়ে! ঠাণ্ডা কী একটা জিনিস! সোজা হয়ে উঠতেই সে পারল না কিছুক্ষণ। তার ওপর দিয়ে মানুষ ছুটতে লাগল।

মাথা তুলে সোজা হয়ে যখন দাঁড়াতে পারল ফিনকি, তখন তার মুখ ফুলে গেছে। কানে আসছে ভয়ানক গোলমাল, মার্ মার্ শব্দ আর একটা মর্মন্তুদ আর্তনাদ উঠছে ওধারে। কা হয়েছে, কে ধরা পড়েছে, তা জানবারও উপায় নেই। কার সাধ্য এগোয় ওদিকে!

কিন্তু নামল কী একটা পিঠ বেয়ে যেন !

ফিনকি সরে গিয়ে দাঁড়াল মন্দির ঘেঁষে। হাত ঘুরিয়ে বহু চেষ্টায় টিপে ধরলে সেটাকে জামার ওপর থেকে। পেছন দিকে কোমরের কাছে আটকে রয়েছে। তারপর টেনে বার করলে সেটা। সঙ্গে সঙ্গে তার দুই চোখ কপালে গিয়ে উঠল। হাতের মুঠিতে চেপে ধরে কোনও রকমে সে এগতে লাগল সামনের দিকে মন্দিরের গা ঘেঁষে।

ততক্ষণে পুলিস ভিড় হটাতে আরম্ভ করছে।

"চলে যান আপনারা, অনর্থক ভিড় করবেন না, একে একে বেরিয়ে যান মায়ের বাড়ি থেকে।"

এর ওর তার পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছলে ফিনকি এগিয়ে গেল। ওই যে, তোলা হয়েছে চোরকে পুলের ওপর।

আরে, এ যে ধনা !

ইস্, কী অবস্থা হয়েছে ওর চোখ-মুখের !

ফিনকি আরও এগিয়ে গেল।

ওই তো হালদাব মশায় না ! মাথা খুঁড়ছেন কেন উনি ওভাবে !

স্পষ্ট শুনতে পেল ফিনকি, হালদার মশায় বলছেন—"দে বাবা ধনু, বলে দে তুই, কোথায় ফেলেছিস সেটা ! ও হারে যতটা সোনা আছে তার দাম তোকে আমি এখুনই দিচ্ছি। আমার মুখটা রাখ্ বাবা—"

কে একজন হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "থামুন আপনি, থামুন। দেখছি আমরা ও বলে কি না !"

তারপর উঠল আবার একটা বুক-মোচড়ানো চিৎকার। যেন কার ঘাড় মুচড়ে দেওয়া হল।

আবার একজন গর্জে উঠল, "তা হলে পালাচ্ছিলে কেন তুমি ?"

কী যেন বলতে গেল ধনু, বলতে গিয়েও বলতে পারল না। আবার ককিয়ে কেঁদে উঠল।

হালদার মশায় মুখ তুললেন। তাঁর কপাল ফেটে দরদর করে রক্ত ঝরছে।

ফিনকি আর স্থির থাকতে পারলে না। নীচে থেকেই চেঁচিয়ে উঠল, "হালদার মশায়, পেয়েছি আমি, পেয়েছি সেটা, এই দেখুন।"

সমস্ত লোকের নজর গিয়ে পড়ল তার দিকে। পুলের নীচে দাঁড়িয়ে ছেঁড়াখোঁড়া-ময়লা-কাপড়-পরা মেয়েটা ডান হাত তুলে চেঁচাচ্ছে। তার হাতে ঝুলছে সেই হার, চকচক করছে হারছড়া। সেই লকেটটিও দুলছে হারের তলায়।

এক দিনের জন্যে রানী হয়ে গেল ফিনকি।

একটি মাত্র প্রশ্নের জবাব দিতে হল ওকে।

"কোথায় পেলে তুমি মা হারছড়া?"

"কুড়িয়ে পেলাম মায়ের চরণামৃত নেওয়ার নর্দমায়।" একটা ছোট্ট ঢোক গিলে ফিনকি বললে।

বাস্, আর একটি কথাও কেউ জিজ্ঞাসা করলে না ওকে। হতদরিদ্র মেয়েটাকে মাথায় তুলে নাচতে লাগল সকলে। তৎক্ষণাৎ নতুন শাড়ি সায়া জামা পরানো হল, নগদ পঁচিশ টাকা দিয়ে প্রণাম করল কুমারীকে নতুন বউটি। তার শাশুড়ী দিলেন নিজের কড়ে আঙুল থেকে আংটি খুলে ওর আঙুলে পরিয়ে। আংটিটা ঢলঢল করতে লাগল। আরও পঞ্চাশজন যাত্রী টাকা পয়সা ছুঁড়ে ফেলতে লাগল ওর পায়ের কাছে। নাটমন্দিরে ওকে দাঁড় করিয়ে প্রণাম করা শুরু হয়ে গেল।

হালদার মশায় একটিবারের জন্যে নড়লেন না ওর পাশ থেকে। তাঁর যজমানরা তাঁকে ওখানে প্রণাম করেই বিদেয় নিলে। এতবড় একটা ঘটনা ঘটার দরুনই বোধ হয় তাঁর দুই ছেলে এসে উপস্থিত হল মায়ের বাড়িতে। বাপ মারা যাচ্ছে শুনেই বোধ হয় ছুটে এসেছিল তারা। কাজেই যজমানদের তারাই বিদেয় দিলে। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এল। হালদার মশায় যা কিছু পেলেন, তা তারাই নিয়ে গেল বাড়িতে। হালদার মশায় কিছুতেই সে সময় বাড়ি

যেতে রাজী হলেন না। এমন কি মুখে চোখে একটু জলও দিলেন না তিনি। ঠায় বসে রইলেন মেয়েটার পাশে।

তার পর এক সময় টাকা পয়সা সব কুড়িয়ে মেয়েটার আঁচলে বেঁধে দিয়ে বললেন, "চল্ তো মা, এবার তোর বাড়িতে পৌঁছে দি তোকে।"

বেশ ঘাবড়িয়ে গেল ফিনকি। কেন, তাকে আবার পৌঁছে দিতে যাবেন কেন হালদার মশায়! সে তো একলাই বেশ যেতে পারবে। আর সেই হতচ্ছাড়া বাড়িতে নিয়েই বা সে যাবে কী করে হালদার মশায়কে!

কিন্তু কোনও আপত্তিই খাটল না। একটু যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে, যেন একটু কেমন টলতে টলতে ফিনকির হাত ধরে হালদার মশায় বেরিয়ে গেলেন নহবতখানার নীচের গেট দিয়ে। সবাই চেয়ে রইল, অনেকে আবার চেয়েও দেখল না। হালদার মশায় কিন্তু কারও দিকে তাকালেন না। ফিনকি শুধু এভাবে সেজেগুজে সকলের চোখের সামনে দিয়ে হালদার মশায়ের হাত ধরে বেরিয়ে যেতে লজ্জায় মরে যেতে লাগল। মাথা নিচু করে সে বেরল সেদিন মায়ের বাড়ি থেকে। তবে রানীর মত বেরিয়ে গেল, কিন্তু মুখখানি একটু নুইয়ে।

মুখ আর তুলতেই পারল না ফিনকি বেশ কয়েকটা দিন। হেন মানুষ নেই যে তারপর সেধে ওদের বাড়িতে এসে দুকথা শুনিয়ে গেল না ওকে আর ওর মাকে।

"এমন হাবা মেয়ে মা তোমার, হাতের লক্ষী পায়ে ঠেললে!"

"কপাল মা, সবই তোমার ওই পোড়া কপালের নেখন। ওই সোনাটুকু দিয়েই পার করতে পারতে ওই আপদকে।"

"মেয়েরও কপাল মা, বলে—কপালে নেইক ঘি, ঠক্ঠকালে হবে কী!"

"তা নয় গো, তা নয়। হাড়-বিচ্ছু মেয়ে বাবা, হাড়ে হাড়ে বুদ্ধি।

যখন দেখলে ওর ওই ধনাকে মেরে তুলো ধুনে দিচ্ছে তখন আর থাকতে পারলে না।"

"ও বাছা, ও সব আমরা বুঝি। বুঝলে, সবই আমরা বুঝি। ধম্মের কল বাতাসে নড়ে। যেমন বাপ তার তেমনি মেয়ে হবে তো।"

সকলের সমস্ত রকম মতামত ঘরের ভেতর মুখ লুকিয়ে বসে শোনে ফিনকি। তার মা দাঁতে দাঁত দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন পাকা মেঝের দিকে চেয়ে। রাতে যখন বাড়ি ফেরে ফনা, তখন তাকে মা বলেন, "হ্যাঁ রে বাবা, আর কোথাও কি একটু মাথা গুঁজে থাকার ঠাঁই জোটে না কিছুতে?" বোন ফিনকি দাদা ফনাকে খুব লুকিয়ে বলে, "দাদা, আমাদের নিয়ে চল কোথাও, আর যে পারি না আমি এখানে এভাবে মরতে।" নিরুপায় দাদা দাঁতে দাঁত ঘষে আর গর্জায়, "শালা-শালীরা আমার সামনে কিছু বলতে আসে না কেন কোনও দিন? টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব কামড়ে।" কিন্তু কামড়াকামড়ি সত্যিই করতে যাবে না ফনা। কারণ ওরা তিনজন মরমে মরে আছে যে। আজ যদি ফনার বাবা থাকত, অন্তত কোথায় সে লুকিয়ে আছে এটুকুও যদি জানতে পারত ওরা, তা হলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারত ফনা। মুখ লুকিয়ে থাকতে হত না ওর মাকে। আর বোনটাকেও ওভাবে কেউ বেইজ্জত করতে পারত না। সাহসই করত না কেউ ওদের মুখের ওপর কথা বলতে। ওই একটি মাত্র দগদগে ঘা আছে যেখানে কেউ ছুঁলে যন্ত্রণায় শিউরে ওঠে ছেলে মেয়ে মা—তিনজনেই। তাই ওরা মুখ বুজে সহ্য করে সব, অনবরত চেষ্টা করে যাতে ওই কথাটা উঠে না পড়ে কোনও মতে। আর মানুষেও ঠিক ওই দগদগে ঘা-খানার ওপরেই চিমটি কাটে।

ফনা-ফিনকির বাবা পালিয়ে গেছে।

ওদের বাবা লুকিয়ে আছে কোথাও।

কেন লুকিয়ে আছে, কী এমন করেছে যে লুকিয়ে আছে সে? লুকিয়ে থাকবে আর কতকাল? কোথায় লুকিয়ে আছে?

ছেলে মেয়ে দুজনের মনেই এ জাতের অনেক প্রশ্ন অনেকবার মাথা তুলে উঁকি মারে। কিন্তু কিছুই জানার উপায় নেই সঠিক। নানা জনে নানা কথা বলে। কেউ বলে চুরি করে গা ঢাকা দিয়েছে ধরা পড়বার ভয়ে। কিন্তু কবে সে কার কী চুরি করেছে তা কেউ বলতে পারে না। কেউ বলে সাধু হয়ে চলে গেছে তপস্যা করতে। কিন্তু কোথায় গেছে তপস্যা করতে তাও কেউ বলতে পারে না। আবার এমন কথাও অনেক বলতে ছাড়ে না যে লোকটা পালিয়েছে নিজের ওই বউয়ের জ্বালায়। তারপর সব এমন কথা বলে যা ফনা-ফিনকির শুনলেও পাপ হয়।

তাদের মা, হাড়-চামড়া-সার মা তাদের, শতছিন্ন একখানা কয়লার মত কালো শাড়ি আর হাতে দুগাছি শাঁখা পরা জনমদুঃখিনী তাদের জননীকে কেউ কিছু বলছে মনে হলেই, তারা পালায় সেখান থেকে। ঝগড়াঝাঁটি বাদ প্রতিবাদ করার. এমন কি মুখ তুলে টুঁ শব্দটি করারও আর সামর্থ্য থাকে না ছেলে-মেয়েব। ঘবে ফিরে মাকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয় না কোনও কথা।

বাবা কেন গেল, কোথায় গেল, কবে ফিরবে—এ প্রশ্নগুলো জানতে চাইলেও যে বোবা মা কী ভাবে ভেতরে ভেতরে গুমরে মরেন এটুকু ওরা চাক্ষুষ দেখে কিনা। কাজেই বোবা হয়ে থাকে।

বোবার নাকি শত্রু থাকতে নেই।

ওরা ভাই-বোনে কিন্তু হাড়ে হাড়ে বুঝেছে যে বোবার শত্রু সবাই। মুখ ছোটাতে পারলে অনেক আপদ বালাই দূরে ঠেকিয়ে রাখা যায়। বোবা হয়ে থাকলে আপদ বালাই হুমড়ি খেয়ে এসে ঘাড়ে পড়ে। জানে কিনা সবাই যে বোবারা বড় জোর দাঁত খিঁচুবে, মুখের জোরে ভূত তো আর ভাগাতে পারবে না।

কিন্তু দাঁত খিঁচিয়েই সেদিন এক ভূতকে তাড়িয়ে ছাড়লে ফিনকি। হ্যাঁ, শুধু দাঁত খিঁচিয়েই তাড়ালে তাকে, বরং বলা চলে দাঁতও খিঁচুতে হল না তাকে তাড়াতে। চোখ বাঁকা করে চাইতেই সুড়সুড় করে সরে পড়ল সে। আর মুখখানাকে এমন করে গেল যে সে মুখ মনে পড়লেই হাসির ঠেলায় দম ফেটে মরবার দশা হয় ফিনকির। পাকা চোরেরাই ও-রকম কাঁচুমাচু করতে পারে মুখের অবস্থা, আর সেই জন্যেই অত মার খেয়ে মরে।

সেদিন সকাল হবার আগে থেকে টিপটিপে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। সারাটা দিন ফিনকি আটকে রইল ঘরে। বিকেলের দিকে জলটা একটু ধরল, চিকচিকে রোদ দেখা দিল একটু। ঘরে নেই এক ফোঁটা কেরোসিন, কাজেই একটিবার বেরতে হল ফিনকিকে বোতলটা হাতে করে। মা বললেন, "যাবি আর আসবি, বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগিয়ে একটা কিছু বাধিয়ে বসিস নি যেন এ সময়।" ফিনকি ছুটল, এক রকম ছুটেই বেরল বাড়ি থেকে। কিন্তু আর ছোটা সম্ভব নয়, গলিতে একহাঁটু কাদা। কাজেই পা টিপে টিপে কাদা বাঁচিয়ে সে এগতে লাগল। গলি থেকে রাস্তায় উঠতেই একেবারে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল সে। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, "একবারটি সোনার কার্তিকের ঘাটে যাবি সন্ধ্যে-বেলা, একটু কথা আছে।" বলেই হনহন করে সোজা চলে গেল।

এমন হকচকিয়ে উঠেছিল ফিনকি যে প্রথমে বুঝতেই পারে নি

মানুষটা কে! অনেকটা এগিয়ে গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে চাইলে সে ফিনকির দিকে। তখন ফিনকি চিনতে পারলে। ওরে মুখপোড়া হনুমান, এতখানি সাহস তোর! আচ্ছা, দাঁড়া।

তেল নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিনকি ফিরে গেল ঘরে। তারপর ভাবতে বসল। আচ্ছা, কী কথা আছে ওর! ফিনকির সঙ্গে ওর কী এমন কথা থাকতে পারে? আর অমন করে লুকিয়েই বা ও বলে গেল কেন ফিনকিকে সোনার কার্তিকের ঘাটে যাবার জন্যে? যা বলবার তা ওখানে বলে গেলেই তো পারত, সে কথা শোনবার জন্যে সোনার কার্তিকের ঘাটে যেতে হবে কেন?

নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে ভেতরে। পাকা চোর তো ওটা, চোরের মন পুঁই-আদাড়ে। হয়তো কোনও বদ মতলব থাকতে পারে ওর পেটে। কিন্তু সে সব মতলব থাকলেই বা করবে কী ও ফিনকির! ওঃ, ভারি আমার নবাব রে, ওঁর ডাকে অমনি আমি ছুটলুম আর কি ঘাটে!

এই পর্যন্ত মনে মনে ভেবে ফিনকি নবাবটিকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে চাইলে মন থেকে। কাজে লেগে গেল সে, ঘর-ঝাঁট দিলে, কেরোসিন পুরলে বাতিতে, ঘরের মেঝেয় মায়ের আর তার বিছানাটা পেতে ফেললে। দাদার ধুতিখানা কুঁচিয়ে রাখলে তার তক্তাপোশের ধারে, কাজ থেকে ফিরে আড়তের কাপড় ছেড়ে ফেলে দাদা। তারপর আর কোনও কাজ খুঁজে না পেয়ে নিজের জট-পাকানো চুলগুলো একটা দাড়াভাঙা চিরুনি দিয়ে টানাটানি করতে বসল। তখন আবার নতুন করে মনে পড়ে গেল সেই চোয়াড় ভূতটার কথা।

আচ্ছা, কী এমন কথা আছে ওর!

যদি যায়ই ফিনকি সেই ঘাটে, তা হলে কীই বা করতে পারে সে ফিনকির! ওঃ, অমনি করলেই হল কিছু! দাঁত নেই ফিনকির, এক কামড়ে এক খাবলা মাংস তুলে নেবে না ওর গা থেকে! মার খেয়ে মরেই যেত সেদিন, ভাগ্যে ফিনকির দয়া হল! হ্যাঁ, দয়াই তো, দয়া করেই তো সে ফেরত দিলে হারটা। দয়া নয়তো কী? চুপচাপ

থেকে সব ঠাণ্ডা হলে যদি সে ওটা বাড়ি নিয়ে আসত তো কী হত ? মার খেতে খেতে বাছাধনকে সেদিন ওই মায়ের বাড়িতেই চোখ ওল্টাতে হত। আবার সাহস দেখাতে এসেছে ফিনকির কাছে, মড়া-খেকো যম কোথাকার !

কিন্তু যদি ফিনকি যায় তো সে বলবে কী ওকে !

চেনা নেই জানা নেই, জীবনে কখনও ওর সঙ্গে ফিনকি কথা বলে নি। কে এক ধনা না ধনা ! দেখেছে অনেকবার ওকে মায়ের বাড়িতে, এধারে ওধারে। সবাই ওর নাম জানে, সবাই জানে যে ও হল কে এক ডালাধরার ছেলে, এই কালীঘাটেই থাকে। পকেট মারতে গিয়ে প্রায়ই মারধোর খায়, মারধোর দিয়েই ছেড়ে দেয় ওকে সকলে। তাই সবাই ওর নাম জানে। সেই ধনার এমন কী কথা থাকতে পারে ফিনকির সঙ্গে ! কী বলবে সে ফিনকিকে যদি ফিনকি যায় এখন ঘাটে ?

নচ্ছারের বেহদ্দ বাঁদরটা। ওর জন্যেই এত কথা এখন শুনতে হয় ফিনকিকে। লোকে মনে করে যেন কতকালের ভাব ওর সঙ্গে ফিনকির ! লোকে বাড়ি বয়ে এসে মুখের ওপর বলে যায় যাচ্ছেতাই সব কথা। কেন বাঁদরটা ওর জামার ভেতর ফেলতে গেল সেদিন হারছড়াটা ! আচ্ছা, ওই ধনাই যে ফেলেছিল সেটা ওর জামার মধ্যে তাই বা কে বললে ! এমনও তো হতে পারে যে ও শুধু শুধু মার খেয়ে মরছিল ! ও পকেট মারে বলেই ওকে ধরে পিটনো হচ্ছিল ! আসলে যে লোক ছিঁড়ে নিয়েছিল ওই হারটা বউটির গলা থেকে, তাকে মোটে ধরতেই পারে নি কেউ। সেই লোকটাই হারছড়া ফিনকির ঘাড়ের কাছ দিয়ে জামার ভেতর ছেড়ে দিয়ে সরে পড়েছিল। সে নিশ্চয়ই ওই ধনা ছোঁড়া নয়।

আচ্ছা, কী হয় একবার ঘাটে গেলে !

কী করতে পারে ওই ছোঁড়া ফিনকির !

ওঃ, অমনি করলেই হল কিনা কিছু, ছেলেমানুষ কিনা ফিনকি এখনও !

কিন্তু যদি কেউ দেখে-টেখে ফেলে !

কে দেখবে এখন ? দেখবার জন্যে কে এখন হাঁ করে বসে আছে সেই ঘাটে ?

আর দেখলেই বা হবে কী ?

কার কথার তোয়াক্কা রাখে ফিনকি ?

দেখুক না কে দেখবে, বলুক না কে কী বলবে ! এমনিই মিছিমিছি যখন এত কথা বলছে লোকে তখন যাবে ফিনকি ঘাটে। বলুক লোকে যা বলবার। লোকের কথার মুখে ফিনকি লাথি মারে এই এমনি করে।

সত্যিই পাটা ঠুকে ফেললে ফিনকি মেঝেয়।

কিন্তু তার পর ! এখন মাকে কী বলে বেরনো যায় বাড়ি থেকে ? একটু পরেই তো মা সন্ধ্যে করতে বসবে আসনে।

তখন ফিনকিও দেবে এক ছুট। শুধু বলে যাবে, "ওই যাঃ, পয়সা কটা আবার ফেলে এসেছি মুদীর দোকানে।" বলেই দেবে ছুট, মা বাধা দেবার ফুরসতই পাবে না।

যথা সঙ্কল্প তথা সিদ্ধি।

পৌঁছল ফিনকি ঘাটে। একে মেঘলা দিনের সন্ধ্যে, তার ওপর কাদায় এমন পিছল হয়েছে পথঘাট যে আছাড় খেয়ে মরবার শখ না চাপলে কেউ সহজে বেরয় না ঘর ছেড়ে।

কাকপক্ষী নেই ঘাটে। বেশ একটু কোল-আঁধারে গোছের হয়ে উঠেছে। ফিনকির মনে হল, এতক্ষণ পরে তার খেয়াল হল কথাটা যে এসে হয়তো সে ভাল কাজ করে নি। গেল কোথায় ছোঁড়াটা !

মানে, ফিনকি এ কথাটা একরকম ধরেই নিয়েছিল যে সে থাকবেই ঘাটে। এসেই ফিনকি তার দেখা পাবে। কিন্তু এ কী ! কেউ নেই তো কোথাও !

একবার ঘুরে দেখল ফিনকি সব ঘাটটা। না, কেউ নেই কোথাও।

গোটা কয়েক কুকুর পড়ে রয়েছে এক কোণে কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে। আর একেবারে ভেতর দিকে বৃষ্টির ছাট যাতে না লাগে গায়ে এমন এক কোণে কে একটা ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

তখন আর করবে কী ফিনকি, দেরি করার উপায় নেই তার। কাজেই ফিরল। গোটা কতক সিঁড়ি নেমে মায়ের ঘাটে উঠতে যাবে এমন সময় ঠিক পেছনে শুনতে পেলে, "এই, ফিরে যাচ্ছিস যে!"

টপ করে ঘুরে দাঁড়াল ফিনকি।

আরে, আবার দাঁত বার করে হাসছে যে!

দুই চোখে আগুনের ফিনকি ছুটল ফিনকির। মুখটা একদম ফাঁক হল না তার। দাঁতের ভেতর থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে, "ডেকেছ কেন?" আর একজনের দাঁত বন্ধ হল তৎক্ষণাৎ। খাবি খাবার মত একবার হাঁ করলে সে, বোধ হয় কিছু বলতেই চাইলে, পারলে না।

আবার ফিনকি সেই সুরে সেই রকম ভাবে ওর চোখের দিকে চেয়ে বললে, "কই, বল না কী বলবে?"

জবাব হল শুধু খানিকটা তোতলামি, "এ-এ-এ এই তা-তা-এই মা-মা-মানে—"

ধমকে উঠল ফিনকি, "বল না ভাল করে কী বলতে চাও?"

তোতলামিও বন্ধ হল। শুধু সে জুলজুল করে চেয়ে রইল ফিনকির চোখের দিকে। নিজের হাত দুটো নিয়ে যে কী করবে ঠিকই করতে পারছে না যেন। অনবরত দু হাত মোচড়াতে লাগল।

অবস্থা দেখে ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল ফিনকির। হাসি চেপে গলার সুরটা বেশ নরম করে বললে, "ছিঃ, চুরি কর কেন? অত মার খাও তবু লজ্জা করে না তোমার?"

এতক্ষণ পরে আওয়াজ ফুটল গলায়। কেমন যেন কান্নার মত শোনাল কথা কটা, "চুরি আর আমি করব না, মাইরি বলছি তোকে, আর কখ্খনো আমি ও সব কাজে হাত দোব না।"

পিঠ চাপড়াবার মত সুরে ফিনকি বললে, "তা হলে আর তোমায়

ধরে কেউ ঠেঙাবেও না। কিন্তু আমায় ডেকে আনলে কেন? শীগগির বল, এক্ষুনি না গেলে মা টের পাবে।"

হঠাৎ সে নড়ে উঠল। পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কী একটা বার করলে। ঝাঁ করে ধরলে ফিনকির হাত। তারপরই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে খালের ভেতর মিলিয়ে গেল।

ব্যাপারটা ঘটল চোখের পলক না ফেলতেই। বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল ফিনকি, তারপর সে টের পেলে যে তার হাতেয় মুঠোয় কাগজে মোড়া কী একটা শক্ত জিনিস যেন রয়েছে।

কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই তখন। তাড়াতাড়ি ফিরে চলল সে। এমন পিছল যে তাড়াতাড়ি পা ফেলার উপায় নেই। গলিতে গ্যাস জ্বলে উঠেছে। ফিনকির সাহস হল না কোনও গ্যাসের তলায় দাঁড়িয়ে কাগজের মোড়কটা খুলে দেখে কী হাতে গুঁজে দিয়ে গেল সে। দেরি না হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে! আঁচলের খুঁটটা সে টিপে দেখে নিলে। কেরোসিন আনার ফেরত পয়সা কটা ঠিকই আছে আঁচলে। গিয়েই মায়ের সামনে পয়সা কটা নামিয়ে দিয়ে বলবে, কী ঝঞ্ঝাট করে পয়সা কটা আদায় করতে হল দোকানীর কাছ থেকে! কাল সকালে গেলে কিছুতেই আর দিত না দোকানী। বাস্, কোনও গোলমাল হবে না।

কিন্তু কী ও দিয়ে গেল হাতে গুঁজে!

যাই হোক, সে এক সময় দেখলেই হবে। পেটের কাছে গুঁজে ফেললে ফিনকি জিনিসটাকে। তখন আবার মনে পড়ে গেল সেই মুখখানার অবস্থাটা। ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল ফিনকির। চোর না হলে কেউ ও রকম কাঁচুমাচু করতে পারে মুখ! অসম্ভব।

দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কোনও কথা নেই, অন্তত থাকা উচিত নয়— এইই হল কংসারি হালদার মশায়ের সুচিন্তিত অভিমত। অনেক দেখে অনেক শুনে শেষ পর্যন্ত এইই তাঁর ধারণা হয়েছে। নয়তো এটা কী করে সম্ভব হচ্ছে যে দিনের পর দিন তিনি ঘরে বন্ধ হয়ে রয়েছেন, রাতের পর রাত তিনি চুপ করে চিত হয়ে শুয়ে আছেন বিছানায় আর তাঁর লাঠিখানা ওই কোণে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেওয়াল ঠেস দিয়ে! ঠিক সময় সূর্য উঠছে, মায়ের মন্দির খুলছে, মায়ের রান্নাঘরে ভোগ চাপছে, লোকে মাকে দর্শন করতে আসছে, ডালাধরারা ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরছে মায়ের বাড়ির ভেতরে বাইরে, টিনের কৌটো-ধরারা আর ভাঙা সরা-ধরারা রাস্তায় ঘাটে কাতরাচ্ছে, কুমারীর গর্ভধারিণীরা কুমারী হবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নাম না-জানা জন্তু-জানোয়ারের দুধ থেকে তৈরী সন্দেশ-চটকানো মায়ের মুখের সামনে ধরা হচ্ছে! ওধারে গঙ্গাটায় শুকনো ধুলো উড়ছে, কেওড়াতলার ধোঁয়ার গন্ধ ঘরে শুয়েও হালদার মশায় নাকে টানছেন। আর মায়ের মন্দির যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন সেই নিশা-মহানিশায় মায়ের বাড়ির আশেপাশে রাস্তায় ঘাটে গলিতকুষ্ঠওয়ালা গোদা গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে নাক কান-খসে-যাওয়া পক্ষাঘাতে পঙ্গু সুন্দরীর পাশে স্থান পাবার জন্যে কানা উড়েটার সঙ্গে নিঃশব্দে খামচা-খামচি করছে। নামছে, সবই নেমে যাচ্ছে, মিশিয়ে যাচ্ছে, এক হয়ে যাচ্ছে। এতকাল পরে ছুটি পেয়ে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে হালদার মশায় একটি বড় মিষ্টি সুর শুনতে পাচ্ছেন, গুনগুন করে যেন কে গান গাইছে তাঁর কানের কাছে! নামার গান, সব এক হয়ে মিশে গিয়ে পথের ধুলোয় সমান হওয়ার গান।

মনে মনে দিবারাত্র অষ্টপ্রহর হালদার মশায় সাজিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছেন আগাগোড়া জীবনটাকে। জীবনভোর কত কী খেয়েছেন পরেছেন বা

কার কাছে কতটুকু পেয়েছেন, কাকে কী দিয়েছেন, এ সমস্ত হিসেব-নিকেশ তাঁর মনেও পড়ছে না। শুধু কত রকমের কত কী দেখেছেন, কেমন করে আগাগোড়া সব-কিছু পাল্টাতে পালটাতে কী রূপ ধারণ করেছে এখন, এই সমস্ত মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন হালদার মশায়। যতই মিলিয়ে দেখছেন ততই তাঁর ধারণা হচ্ছে, দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কোনও কথা নেই, অন্তত থাকাটা উচিত নয়।

হালদার মশায় শুয়ে শুয়ে মনে মনে একবার ঘুরে এলেন আগাগোড়া কালীঘাটটা। সেই উত্তরে পোলের কাছ থেকে দক্ষিণে কেওড়াতলা পর্যন্ত আর পুবের সেই ট্রাম-রাস্তা থেকে পশ্চিমে খাল পর্যন্ত। বাস্, বলা উচিত এইটুকুই কালীঘাট। কিন্তু তাও ঠিক নয়, কালীঘাট হল সেইটুকু স্থান, যেখানে তারা থাকে যারা কালীবাড়ি আছে বলেই টিঁকে আছে, যাদের বাঁচা-মবা নির্ভর করে মা-কালীর বাঁচা-মরার ওপর। আচম্বিতে একদিন যদি এমন হয় যে মা তাঁর মন্দিরসুদ্ধ রাতারাতি অন্তর্ধান করেন কালীঘাট থেকে! এমন হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়, তা হলে এতগুলো মানুষ করবে কী! রাত পোয়ালে যখন সবাই দেখবে যে মন্দির নেই, কিছু নেই, একটা অতলস্পর্শ দ হাঁ করে রয়েছে ওই জায়গায়, তখন মানুষগুলোর অবস্থাটা কী দাঁড়াবে! মন্দির আছে, মা-কালী আছে, তাই ওরা আছে। একটি মাত্র পেশা সকলের, পেশাটির নাম মা-কালী পেশা। মানে মা-কালীর নামে হাত পাতা পেশা। ওই পেশারই কয়েকটা ধাপ বানানো হয়েছে। যারা ডালা ধরে, যারা ঘাটে বসে পিণ্ডি দেওয়ায়, যারা নাটমন্দিরে বসে হোম-যাগ করে মাদুলি দেয়, এরা সব উঁচু ধাপের লোক। এরা মনে করে যারা রাস্তায় ঘাটে চেঁচায় আর কাতরায় তাদের থেকে এদের পেশাটা বেশী সম্মানের পেশা। যেমন ওই ওধারে, খালধারে টিনের খুপরির দরজায় যে জীবগুলো সেজেগুজে হা-পিত্যেশ করে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারাও মনে করে, রাস্তায় যারা গড়াগড়ি খাচ্ছে তাদের চেয়ে ওদের পেশাটার অন্তত কিছু মর্যাদা আছে। ঘর ভাড়া করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে যে জ্যোতিষী রাজা সম্রাট বনে গেছেন আজ, তিনি

যেমন মনে করেন নাটমন্দিরে বসে মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা কারবার চালায়, তারা অতি নিচুদরের প্রাণী।

হালদার মশায়ের মনে পড়ে যায় অনেককে। একদিন যাকে তিনি ছেঁড়া আসন আর কোশাকুশি বগলে নিয়ে নাটমন্দিরের কোণে বসতে দেখেছেন তাকেই তিনি দেখলেন তেতলা বাড়ি হাঁকিয়ে সম্রাট-জ্যোতিষী বনে যেতে। যে মেয়েকে তিনিই দেখেছেন সত্যপীরতলায় মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে, তাকেই তিনি দেখলেন ঢাউস মোটরগাড়ি থেকে নেমে মায়ের মন্দিরে সোনার গিনি দিয়ে প্রণাম করতে। আবার উলটোও বহুত দেখেছেন। দেশ থেকে এলেন পণ্ডিত মশায়, বাড়ি ভাড়া নিয়ে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে বসলেন মাদুলি দেবার ব্যবসা ফেঁদে, দেখতে দেখতে একেবারে ডালাধরা বনে গেলেন। বাসা নিলেন ওই খালধারেই। কিছুদিন পরে পণ্ডিত মশায়কে চুপটি করে মুখ বুজে হাতে একটি ঘটি নিয়ে সামনে গামছা বিছিয়ে ঘাটের একধারে বসে থাকতে দেখা গেল। গামছার ওপর চালে-ডালে-মেশানো পোয়াখানেক খুদকুঁড়ো আর কয়েকটা পয়সা পড়ে আছে। এমন মেয়েকেও তিনি চেনেন, যে মহিম হালদার স্ট্রীটের মোড়ে দোতলা বাড়ির বাড়িউলী ছিল, সেই মেয়েই এখন ডালাওয়ালার দোকানে যাত্রীর হাতে জল ঢেলে দেওয়ার কাজ করছে।

অদ্ভুত ব্যাপার নয়, তাজ্জব কাণ্ড নয়, সবই সম্ভব। অসম্ভব বলতে কোনও কিছু নেই এই দুনিয়ায়। কংসারি হালদার মশায় দিবারাত্র বিছানায় শুয়ে চিন্তা করেন আর মিলিয়ে দেখেন যে, দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছু থাকাটাই শুধু অসম্ভব। আর অসম্ভব কিচ্ছু নেই।

অন্ধকার ঘরে চোখ চেয়ে কান খাড়া রেখে বিছানায় শুয়ে থাকেন হালদার মশায়। রাত গড়িয়ে যায়। গড়িয়ে যায় বললে ঠিক বলা হবে না, বলা উচিত পা টিপে টিপে পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়াটা তিনি স্পষ্ট দেখতে পান, তাঁর অন্ধকার চোখ দুটি দিয়ে। আর কিছুই দেখতে পান না, কিচ্ছু না, শুধু দেখেন পলায়ন। অতি সন্তর্পণে চোরের মত নিঃশব্দে রাত পালিয়ে যাচ্ছে, এইটুকুই তিনি দেখতে পান শুধু। চোখ বুজে থাকলেও দেখতে পান।

কিন্তু কানে তিনি শুনতে পান সবই। ঘরের দেওয়ালে টিকটিকি-দম্পতির পায়ের আওয়াজ পর্যন্ত স্পষ্ট শুনতে পান। শেষ পর্যন্ত শুনতে পান, যা শোনার জন্যে সারাটা রাত তিনি কান খাড়া করে থাকেন।

হ্যাঁ, ওই তো! এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে, ঘুরছে গলির ভেতর, এগিয়ে আসছে মহামায়া লেন কালী লেন ভগবতী লেন দিয়ে। ওই তো!

নিজের নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন হালদার মশায়। দম বন্ধ করে শুনতে লাগলেন—

"তাই মা আমি নিলাম শরণ
তোর ও দুটি রাঙা চরণ
নিলাম শরণ ॥
এড়িয়ে গেলাম মায়ার বাঁধন
মা তোর অভয় চরণ পেয়ে।
জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস মা
শ্যামা কি তুই জেলের মেয়ে ॥"

হালদার মশায় একটু পাশ ফেরবার চেষ্টা করলেন। চিড়িক মেরে উঠল শিরদাঁড়ার মধ্যে। সেটা সামলাবার জন্যে বেশ কিছুক্ষণ আর গানের দিকে মন দিতে পারলেন না তিনি। দম বন্ধ করে আরও

কিছুক্ষণ থাকতে হল তাঁকে। না, আর তাঁকে হয়তো কখনও নিজে উঠে দাঁড়াতে হবে না বিছানা ছেড়ে। সকলে ধরাধরি করে যেদিন তাঁকে বিছানা থেকে নামিয়ে মাটিতে শোয়াবে, সেই দিনই তিনি মাটি স্পর্শ করতে পারবেন। তার আগে আর নয়।

যন্ত্রণার দমকটুকু কমতে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিল। শেষে আবার দম ফেললেন হালদার মশায়। দম ফেলে আবার কান খাড়া করলেন। অনেকটা দূর, বোধ হয় সেই হালদারপাড়া লেনের ভেতর থেকে ভেসে এল—

"পড়ে মা তোর মায়ার ফাঁদে
কোটি নরনারী কাঁদে মা—"

হঠাৎ কী হল হালদার মশায়ের, হু-হু করে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন তিনি। বুক ঠেলে কান্নার ঢেউ তাঁর গলায় এসে আটকে যেতে লাগল। বড় আরাম বোধ হল তাঁর। অন্ধকার ঘরে একলা শুয়ে নিঃশব্দে কাঁদার চেয়ে বড় বিলাসিতা যেন আর কিছুই নেই এই দুনিয়ায়। ভারি সোয়াস্তি পেলেন তিনি কাঁদতে কাঁদতে। তাঁর মনে হল, না, যতটা তিনি নিজেকে একলা বোধ করছেন ততটা একলা নন ঠিক। এই তো, এখনও একটা কিছু তাঁর সঙ্গী রয়েছে। বেশ দুজনে একসঙ্গে শুয়ে আছেন অন্ধকার ঘরে, তিনি এবং তাঁর কান্না। কান্নাটুকু তো এখনও মরে যায় নি, কান্না তো তাঁকে ছেড়ে পালায় নি এখনও! সব গেছে, ওঠা হাঁটা চলা ফেরা দেখা শোনা এসমস্ত তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু কান্না এখনও তাঁকে পরিত্যাগ করে যায় নি। ইচ্ছে করলে তিনি যতক্ষণ খুশি যতবার খুশি কাঁদতে পারেন এখনও। কান্না তাঁর কিছুতে ফুরবে না।

খুশী হলে তিনি দুনিয়াসুদ্ধ সকলের কান্নাই একা কাঁদতে পারেন একলা ঘরে বিছানায় শুয়ে। কেউ তাঁকে বাধা দিতে আসবে না।

"পড়ে মা তোর মায়ার ফাঁদে
কোটি নরনারী কাঁদে
তোর মায়ার জালে মহামায়া বিশ্বভুবন আছে ছেয়ে।"

বার বার এইটুকু মনে মনে আওড়ালেন কংসারি হালদার। আওড়াতে আওড়াতে রাগে তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাবার যোগাড় হল। কান্না ভুলে গেলেন।

কী ভয়ানক মিথ্যে কথা! কী বিতিকিচ্ছি রকম অনর্থক বদনাম দেওয়া মাকে! বলা উচিত—

"পড়ে মা তুই মরিস কেঁদে
কোটি নরনারীর ফাঁদে—"

কে কাঁদে! কাঁদছে কে? ওরা কাঁদছে, না, মা কাঁদছে?

বহুবার দেখা একটা দৃশ্য চোখের ওপর ভেসে উঠল হালদার মশায়ের। মায়ের বাড়িতে হাড়িকাঠে পাঁঠা ঢোকানোর দৃশ্য। চারিদিকে মানুষ দাঁড়িয়েছে, সকলে চেয়ে রয়েছে পাঁঠাটার দিকে। অনেকেই মতামত প্রকাশ করছে, "বেশ বড় যে হে, হবে তো এক কোপে? ঘাড়টা কী মোটা দেখেছ, দাও হে, ঘাড়ে খানিকটা ঘি মালিশ করে দাও। আহা-হা-হা, করছ কী কামারের পো, সামনের ঠ্যাং দুখানা আগে মুচড়ে ভেঙে ওপর দিকে তুলে ফেল না। পায়ে জোর পেলে ওকে রাখবে কী করে? ধর ধর, এবার একজন টেনে ধর মুণ্ডটা, ভাঙল বুঝি হাড়িকাঠের খিল।"

নানা জাতের মতামত, সকলের চোখে একটা ঝাঁজালো দৃষ্টি, তার মাঝে হয়তো দু-একবার পাঁঠাটা চেঁচিয়ে উঠল। ঝাঁ করে চকচকে খাঁড়াখানা উঠল আকাশের দিকে, নামল চক্ষের নিমেষে। বাস্, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল সকলে। চারিদিকের মানুষ নড়েচড়ে উঠে যে যার পথ দেখলে।

এ দৃশ্য, ঠিক এই জাতের ঘটনা অসংখ্যবার হালদার মশায় দেখছেন মায়ের বাড়িতে। বিছানায় শুয়ে আগাগোড়া সেই দৃশ্যটাই তিনি দেখতে পেলেন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ তাঁর চোখের ওপর ফুটে উঠল এই ব্যাপারটার একটা নূতন দিক। এতদিন ধরে তিনি

দেখেছিলেন সেই বোবা পশুগুলোর চোখে ভয় আর একটা করুণ আকুতি, জীবনের জন্যে আকুলি-বিকুলি। কিন্তু না, ও সমস্ত কিছুই নয়। এতদিন তিনি মহাভুল করে এসেছেন, ওদের চোখে তখন যা থাকে তার নাম ঘৃণা, চতুর্দিকের মানুষগুলোর ওপর একটা ঘৃণামিশ্রিত অবজ্ঞার ভাবই তো থাকে সেই বলির পশুর চোখে। আর যা থাকে, তার নাম হচ্ছে অপমানের তীব্র জ্বালা। একলা এতগুলো মানুষের দৃষ্টির সামনে অসহায় ভাবে মরতে যে অপমানটা হয়, সেই দুর্জয় অপমানের দরুন একটা জ্বালা থাকে সেই বলির পশুর চোখে। কাতরতা করুণাভিক্ষা মরণের ভয় এ সমস্ত কিছুই থাকে না তখন ওদের মনে প্রাণে কোথাও। অপমানের জ্বালা ছাড়া আর কিছু থাকে না।

মায়ের চোখেও ওই অসহায়তা আর অপমানের জ্বালা ছাড়া অন্য কিছু নেই। মার আবার তিনটে চোখ। আর একটা চোখে যা রয়েছে তা হল পরিত্রাণ পাবার জন্যে ব্যাকুলতা। বছরের পর বছর, শত শত বছর ধরে ওই ভাবে চেয়ে রয়েছে মা, আর অসহায় ভাবে সহ্য করছে সকলের জুলুম। ভালবাসার জুলুম, ভক্তির জুলুম, হ্যাংলামোর জুলুম। যার যা খুশি আনছে মায়ের সামনে, যার যা খুশি চেয়ে বসছে মায়ের কাছে, যার যা খুশি ঘুষ দিতে চাচ্ছে মাকে। উদয় অস্ত, অস্তের পরেও অর্ধেক রাত পর্যন্ত সহ্য করতে হচ্ছে এই বিড়ম্বনা অসহায় ভাবে মাকে। ছেদ নেই, ছুটি নেই, একটি দিনের তরেও পরিত্রাণ নেই। মানুষে কালীঘাট থেকে আলিপুরে যায় চিড়িয়াখানা দেখতে। সেই চিড়িয়াখানাও বিশেষ বিশেষ দিনে বন্ধ থাকে, সেই চিড়িয়াখানাও অস্ত থেকে উদয় এবং অস্তের পরেও ঘণ্টা চার-পাঁচ খোলা থাকে না কোনও দিন। অষ্টপ্রহরের ভেতর ষষ্ঠপ্রহর চিড়িয়াখানার পশুকেও মানুষের চোখের দৃষ্টির সামনে বেইজ্জত হতে হয় না, যেমন হয় কালী-ঘাটের কালীকে। চিড়িয়াখানার পশুর সঙ্গে মায়ের তফাত আরও অনেক রয়েছে। ওরাও বন্দী, মাও বন্দিনী ; কিন্তু তফাত হচ্ছে চিড়িয়া-খানার পশুকে দেখিয়ে রোজগারের আশায় এক পাল মানুষের নোলায় দিবারাত্র নাল ঝরছে না। চিড়িয়াখানার পশুর চতুর্দিকে যে সব মানুষ

থাকে তারা মনে করে, ভিড় যত কম হয় মানুষজন যত না আসে ততই মঙ্গল। পশুগুলো তবু শান্তিতে থাকতে পাবে। আর কালী-ঘাটের কালীকে যারা বন্দিনী করে রেখেছে, তারা অহোরাত্র আশা করছে, আরও মানুষ আসুক, আরও ভিড় বাড়ুক, আরও বেইজ্জত জ্বালাতন হোক মা-কালী। তবেই না তাদের দু পয়সা রোজগার হবে।

কংসারি হালদার মশায় একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। শ্বাসটির শব্দও তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন কানে। একটু চমকেও উঠলেন। মনে হল তাঁর, ঘরে যেন অন্য কেউ রয়েছে। অন্য কেউ যেন শ্বাস ফেললে তাঁর ঘরের মধ্যে। কিন্তু না, বুঝতে পারলেন, ওটা তাঁর মনের ভুল। এখন কেউ আসবে না তাঁর ঘরে, যেমন মায়ের ঘরেও কেউ ঢোকে না এখন। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ছেঁকাপেঁকা করে ধরবে সবাই মাকে, তেমনি হালদার মশায়ের ঘরেও লোক ঢুকতে থাকবে। দেখতে আসবে সকলে হালদার মশায়কে, যার যা খুশি মতামত বলতে থাকবে। কার সইয়ের বউয়ের বকুলফুলের গঙ্গাজলের বোনপো-বউয়ের মায়ের পায়ের ঘায়ের তেলপড়া দিয়ে কোন্ রোগ সেরেছিল, আর সেই তেলপড়াটুকু এনে হালদার মশায়ের শিরদাঁড়ায় মালিশ করলেই যে তাঁর শিরদাঁড়াটা টনটনে টনকো হয়ে উঠবে চক্ষের নিমেষে, সে সমস্ত শুনতে হবে তাঁকে নিঃশব্দে নির্বিকার চিত্তে। কারণ যারা তাঁকে দেখতে আসবে রাত পোয়ালেই তারা সকলেই তাঁর আপনার জন। তাঁকে একান্ত ভালবাসে বলেই তাঁর ঘরে এসে ভিড় করছে এখন। কিন্তু আশ্চর্য, এতদিন এরা সব ছিল কোথায়? কস্মিনকালে কেউ তাঁর ছায়া মাড়িয়েছে বলেও তো মনে পড়ে না।

হালদার মশায় ভাবেন আর হাসেন। তাঁর দশা আর মা-কালীর দশা আজ সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসহায় ভাবে তাঁকে আর মা-কালীকে দুজনকেই সহ্য করতে হচ্ছে ভালবাসার জুলুম, ভক্তির জুলুম, দরদ দেখানোর জুলুম। ওই বলির পশুর চোখের চাউনি দিয়ে তিনি চেয়ে দেখবেন সকলের মুখের দিকে। সবাই ভুল করবে, মনে করবে সে চাউনিতে বুঝি রয়েছে সকলের কাছে কৃপাভিক্ষার মৌন আবেদন।

হায়, বুঝবে না কেউ, কী অসহ্য অপমান তিনি বোধ করেন তাঁর বিছানার পাশে এসে কেউ দাঁড়ালে, কী রকম অসহায় ভাবে সহ্য করেন তিনি মানুষের দরদ দেখানো! সাধ্য থাকলে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি এদের আত্মীয়তার আবদারের হাত থেকে নিস্তার পেতেন।

সাধ্যে কুলালে আরও অনেক কিছুই করতে পারতেন হালদার মশায়। কিন্তু একটি অসাধ্য-সাধন করতে গিয়েই ইহজীবনের সমস্ত সাধ্য-সামর্থ্যটুকু তিনি খুইয়ে বসেছেন। সেদিন সেই বড়লোক যজমানের নতুন বউটিকে নিয়ে মন্দিরে ঢোকার দুঃসাহস না করলে এত তাড়াতাড়ি এ দশা হত না তাঁর। বড্ড বেশী বিশ্বাস করেছিলেন তিনি নিজেকে, বহুকালের পুরনো শরীরটার ওপর তিনি বড় বেশী নির্ভর করেছিলেন। তাঁর ভাগ্য ভাল যে মিছরিদের ছেলেরা ঠিক সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, নয় তো যজমানদের নিয়ে তিনি বেরতেই পারতেন না মন্দির থেকে। শিরদাঁড়াটা একেবারে অকেজো হয়ে গেছে, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু যজমানদের কিছু একটা হত যদি সেদিন, তারপরও যদি তাঁকে বেঁচে থাকতে হত, তা হলে করতেন কী তিনি সে জীবন নিয়ে! শিরদাঁড়া গেছে যাক, ঘাড় কিন্তু তাঁর সোজা আছে। মাথা তাঁর নোয়াতে হয় নি এখনও। হালদার-বংশে জন্মে আগাগোড়া সারাটা জীবন তিনি ষোলআনা হালদারগিরি করে গেলেন। চলে বেড়াবার সামর্থ্যটুকু যতদিন ছিল, ততদিন ঠিক সময় ঠিক হাজির হয়েছেন মায়ের বাড়িতে। একটি দিনের জন্যেও কামাই করেন নি, শুধু জাতাশৌচের মৃতাশৌচের দিন কটি ছাড়া।

কিন্তু তারপর!

তারপর আর নেই। এইখানেই শেষ হল এ বংশের হালদারগিরি করা। দুঃখও নেই তাতে কংসারি হালদার মশায়ের। অনেক হালদার-গুষ্টিই আজ নেই। মায়ের পালা চালাচ্ছে মুখুজ্জে চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জেরা—

হালদারদের ভাগনে-দৌহিত্ররা সব। আবার অনেক হালদার পুরোহিত বা মিশ্রদের পালা দিয়ে গেছেন চিরকালের জন্যে। এখন সেই সব ভটচার্য-মিশ্ররাই পালাদার মায়ের। কাজেই দুঃখ করার কিছুই নেই হালদার মশায়ের।

কিন্তু তাঁর পালা যে তিনি দিয়েও গেলেন না কাউকে। তাঁর ছেলেরা হবে ওই পালার মালিক। চমৎকার হবে, মায়ের বাড়ির ছায়া যারা মাড়ায় না কখনও, যারা মায়ের মহাপ্রসাদ মুখে ছোঁয়ায় না রোগ হবার ভয়ে, তারা হবে পালাদার! ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে যারা কোট-প্যাণ্ট পরে ব্রেক্‌ফাস্ট করে আপিসে ছোটে, যাদের বউয়েরা মুরগির ডিম কাঁচা খেয়ে আর খাইয়ে নিজেদের আর তাদের ছেলে-পুলেদের শরীর ভাল রাখে, তারা হবে মায়ের পালাদার, চমৎকার! বহুবার তিনি ছেলে বউয়েদের আলাপ করতে শুনেছেন, কালীঘাটের কালীবাড়ির আওতার এই চোদ্দ পুরুষের ভিটেটাকে বেচে বা ভাড়া দিয়ে সেই বালিগঞ্জে চলে যাওয়াই উচিত। এখানে নাকি ছেলে-পুলেদের ঠিকভাবে মানুষ করা সম্ভব নয়। এখানে এই গলির ভেতর এই পচা বাড়িতে থাকলে এ বংশের নাম-টাম কস্মিনকালেও হবে না। ওদের সব গণ্যমান্য বন্ধু-বান্ধবীদের এ বাড়িতে আনতেও ওরা লজ্জা পায়। একবার তো ওরা খেপেই উঠেছিল হালদার উপাধি ত্যাগ করে নামের শেষে শর্মা লেখবার জন্যে। ওদের সেই সমস্ত সাধ আহ্লাদ এখন মিটবে। বাপের শ্রাদ্ধ হবার পরে ওরা শর্মা হবে, উঠে যাবে বালিগঞ্জের ওধারে। আরও কত কী করবে! কিন্তু হালদার-বংশের হালদারত্ব, এই পালা চালানো কর্মটি কাকে দিয়ে যাবে ওরা? কে বইবে এর পর এই দায়িত্ব? ছেলেরা সোজা হিসেব করে বসে আছে, মায়ের বাড়ির পয়সার যখন তাদের দরকার নেই, তখন মায়ের বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধই বা তারা রাখতে যাবে কেন? একদম ন্যায্য কথা, এমন কোন আইন আছে দেশে যে মায়ের সেবায়েতকে মায়ের সেবা করতে বাধ্য করবে? সেবা চালাই, কারণ সেবা চালালে পেটটাও চলে যায়। পেট যখন চালাবার অন্য উপায় হয়েছে তখন কে

যাচ্ছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে! অতি বড় হক কথা, ষোল আনা পাকা যুক্তি, কার সাধ্য এর ওপর কথা বলবে!

যে ছেলে বাপের বিষয়-আশয়ের পরোয়া করে না সে কেন বাপকে ভাত দিতে যাবে? মা-কালীর বিষয়-আশয় বলতে যেটুকুর মালিক এখন পালাদাররা, ওটুকুর উপর নেহাত বেল্লিক ছাড়া আর কারও লোভ থাকতেই পারে না। বংশ বাড়তে বাড়তে, ভাগ হতে হতে আর হাত বদলাতে বদলাতে শ্রীশ্রীশ্রীমতী কালীমাতাঠাকুরানীর নোকরদের বর্তমানে যেটুকু চাকরান অবশিষ্ট আছে, তার মায়া ছাড়তে পারা খুব বড় একটা বাহাদুরির কাজও নয়। মায়ের পালার ওপর লোভ, পালার দরদামের ওপর নির্ভর করে। যাদের সে লোভ নেই তাদের মা আটকে রাখবে কিসের টানে?

হালদার মশায় আড়ষ্ট হয়ে ভাবতে লাগলেন, কিন্তু এই বাড়ি, এই বাড়ির যা কিছু আসবাবপত্র, ওই ছেলেদের জন্ম থেকে খাওয়া-পরা লেখাপড়া শেখা মানুষ হওয়া, ওদের বিয়ের যাবতীয় খরচা, ওদের বাপ মা ঠাকুরদা ঠাকুরমা, এই বংশের ওপর দিকের চোদ্দ পুরুষের খেয়ে-পরে টিকে থাকা সব-কিছুই চালিয়ে এসেছে ওই কালীবাড়ি। এখন ওরা সম্বন্ধ চুকিয়ে দিতে চাচ্ছে ওই কালীবাড়ির সঙ্গে। হালদার মশায়ের মনে পড়ে গেল, একবার তিনি নিধু গোয়ালাকে আর তার তিনটে ব্যাটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে জুতোপেটা করিয়েছিলেন। কারণ তারা দুধ ছেড়ে দেওয়ার দরুন একটা গরুকে কসাইবাড়ি বেচে এসেছিল। নিধু গোয়ালাকে মনে পড়তে হালদার মশায়ের মনে পড়ে গেল যে, আগে হালদাররা গণ্ডা গণ্ডা গয়লা পুষতেন। তাদের আদিগঙ্গার ওপারে জায়গা-জমি দিয়ে ঘরবাড়ি করে বসিয়েছিলেন। গরু কিনে দিয়েছিলেন, সেই গরুর দুধ তারা নিয়ে আসত মায়ের বাড়িতে। তখন মায়ের বাড়ির বাইরে একখানিও ডালার দোকান ছিল না। এতটুকু মিষ্টি বাইরে থেকে কিনে আনলে মন্দিরে ঢুকতে পেত না। মায়ের বাড়ির ভেতর যে সমস্ত মিষ্টির দোকান ছিল, সে সব মিষ্টি তৈরি করত যারা, তারা স্নান করে উপোস করে দুধ জ্বাল দিত। বেচত যারা, তারাও স্নান করে উপোস

করে বসে থাকত সে সব দোকানে। তাই তখন একমাত্র কাঁচাগোল্লা ছাড়া আর কোনও প্রসাদ মিলত না মায়ের বাড়িতে। সে সমস্ত মিষ্টিতে আবার কাশীর চিনি ছাড়া অন্য কোনও চিনি দেওয়ারও উপায় ছিল না। আর এখন দুধ কেউ জ্বালই দেয় না, বাজার থেকে ছানা ক্ষীর কিনে নানা রকম মিষ্টি তৈরি হয়। কোথায় হয়, কে করে সে সব মিষ্টি, কে তার খোঁজ রাখতে যাচ্ছে! তিনশোখানা ডালার দোকানই তো গজিয়ে উঠেছে মায়ের বাড়ির বাইরে। ডালাধরাদের সঙ্গে আবার দোকানদারদের কী সমস্ত লুকনো ব্যবস্থা আছে, টাকায় নাকি তারা তিন আনা হিসেবে দস্তুরি পায়। বাঙালী ওড়িয়া মেড়ুয়া কে না খুলে বসেছে দোকান মায়ের বাড়ির আশেপাশে! কত রকমের কত কারবারই না চলছে কালীঘাটের কালীমন্দির ঘিরে। সব বিক্রি হচ্ছে—ধর্ম ন্যায় নীতি নিষ্ঠা সতীত্ব মনুষ্যত্ব সব। আখেরে গুছিয়ে নেবার গরজে টোপ ফেলে বসে আছে সকলে। কাজেই কী করে তিনি বাধা দেবেন তাঁর ছেলেদের যদি তাদের গুছিয়ে নেবার গরজ না থাকে এখানে! সম্বন্ধ যখন তুলেই দিতে চায় ওরা কালীবাড়ির সঙ্গে, তখন কেন তিনি জোর করতে যাবেন! হালদার মশায় জানেন, যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ মেলে না কখনও। সুতরাং দিক ওরা দুধ-ছাড়া গরুটাকে কসাইয়ের হাতে তুলে, তিনি বাধা দিতে যাবেন না।

কিন্তু কার হাতে এ দায়িত্ব তুলে দিয়ে শান্তিতে সরে পড়বেন তিনি? কার হাতে?

ঘরের ভেতরটা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল। জানলার কাচে লাল আলো এসে পড়ল। হালদার মশায় কাচ কখানা গুনে ফেললেন। গুনতে পেরে বেশ একটু নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। রোজই হন, কাচ কখানা গুনতে পারার মানে হল, চোখের দৃষ্টিটুকু যে এখনও তাঁকে ছেড়ে যায় নি তার প্রমাণ। অর্থাৎ এখনও তিনি ষোল আনা মরে যান নি। উঠতে পারেন না, নড়তে পারেন না আর সন্ধ্যে থেকে ভোর

পর্যন্ত চোখে কিছু দেখতে পান না। কিন্তু ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দেখতে পান। অবশ্য বাইরে বেরিয়ে ইচ্ছামত কোনও কিছুই দেখে আসতে পারেন না। তা না হোক, তাতেও দুঃখ নেই। তবু তো আলোটুকু দেখতে পান। নিবিড় আঁধার এখনও গ্রাস করতে পারে নি তাঁকে। এই জগতের সঙ্গে এখনও ষোল আনা সম্বন্ধ চুকে যায় নি তাঁর। এ কী কম কথা নাকি!

আবার হিসেব করতে লাগলেন হালদার মশায়। একঘেয়ে হিসেব, কতটুকু তিনি হারিয়েছেন, কতটুকু তাঁর হাতে আছে এখনও! অনেক কিছু এখনও হাতে আছে, দিনের আলো চোখে দেখতে পাচ্ছেন। অর্থাৎ এখনও দিন রাত হচ্ছে তাঁর জীবনে। রাতের আঁধারে একলা ঘরে শুয়ে মনের সুখে অঝোরে কাঁদতে পারছেন। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে প্রাণখোলা হাসিও হাসতে পারেন তিনি এখনও। কিন্তু হাসবার মত একটা কিছু পেলে তো হাসবেন। হাসবার মত এখন আর কী ঘটতে পারে তাঁর জীবনে!

খুঁজতে গিয়ে চমকে উঠলেন হালদার মশায়। তাই তো, কাঁদবার মতই বা এখন এমন কী ঘটতে পারে তাঁর জীবনে!

কেন কাঁদতে যাবেন তিনি!

কী উপলক্ষ নিয়ে কাঁদবেন!

কেঁদে কার মন গলাবেন?

কার কাছে কাঁদবেন তাঁর কান্না?

হঠাৎ হালদার মশায় ঘাড় ফিরিয়ে ডান দিকে চাইলেন। খাটের ডান দিকটা খালি। বাঁ দিকে একেবারে কিনারায় তিনি শুয়ে আছেন। অনেক কাল এই জায়গায় শোন তিনি, আর তাঁর ডান দিকটা খালি পড়ে থাকে। আগে ওই খালি জায়গাটায়, মানে দেওয়ালের দিকে তিনি শুতেন আর এধারটায়, মানে—এখন যেখানে তিনি শুয়ে আছেন এই জায়গাটায় আর একজন শুত। কিন্তু সে অনেক কাল আগে।

ধীরে ধীরে হালদার মশায় সেই অনেক কাল আগের কালে ফিরে যেতে লাগলেন। পিছিয়ে গেলেন অনেকটা পিছুতে। ভুলে গেলেন

তাঁর পঙ্গুত্ব, রাতের আঁধার দিনের আলো সব উবে গেল তাঁর মন থেকে। মায়ের পালা কার ঘাড়ে চাপিয়ে সরে পড়বেন তিনি, সে প্রশ্নও ঘুলিয়ে গেল। হাসি-কান্না-সুখ-দুঃখের নাগাল ছাড়িয়ে ডুবে গেলেন হালদার মশায় বহুকাল-আগে-ফুরিয়ে যাওয়া একটা স্বপ্নের মধ্যে। অনেক দিন উৎকট রকম জেগে থাকার পর যেন তিনি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লেন হঠাৎ।

তিনি দেখতে লাগলেন, ইয়া চওড়া বুকের ছাতি, ইয়া গোঁফ আর ঘাড় পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়ানো চুল এক কংসারি হালদারকে। দেখলেন আর একজনকে। নাকের নথটি পর্যন্ত দেখতে পেলেন। তারপর স্পষ্ট দেখতে লাগলেন সেই ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না।

দেখতে দেখতে শুনতে লাগলেন। কংসারি হালদার জিজ্ঞাসা করছেন গাঢ় স্বরে, "কাঁদছ কেন?"

তার উত্তর আরও ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না।

"কী মুশকিল! কাঁদছ কেন মিছিমিছি?"

উত্তর, আরও ফুলে ফুলে নিঃশব্দে কান্না।

নিজের চওড়া বুকের ওপর কংসারি হালদার চেপে ধরলেন তাকে, "ছিঃ, কাঁদতে নেই, কেন কাঁদছ শুধু শুধু?"

উত্তর, কংসারি হালদারের চওড়া বুকে মুখ গুঁজে, কংসারি হালদারের বলিষ্ঠ বাহুর বাঁধনের মধ্যে নিরাপদে নির্ঝঞ্ঝাটে আরও কান্না। যেন কাঁদবার মত এতবড় আশ্রয় আর কোথাও নেই দুনিয়ায়।

আর সেই কান্নার উত্তরে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলেন হালদার মশায়। অনর্থক কান্না তিনি কাঁদতে লাগলেন তার মাথাটার ওপর নিজের মুখখানা গুঁজে দিয়ে। সেই দুর্জয় কংসারি হালদার, যে একটা খেপা মোষকে দু হাত লম্বা একটা ডাণ্ডা দিয়ে ঠেঙিয়ে মেরে এসেছিল দু দিন আগে, সে অসহায় ভাবে একজনকে বুকের সঙ্গে সবলে আঁকড়ে ধরে তার মাথার ওপর সেই ভয়ানক গোঁফসুদ্ধ মুখখানা গুঁজে দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। যেন কাঁদবার জন্যে সেই মাথাটার মত একান্ত নিরাপদ আশ্রয় আর কোথাও ছিল না দুনিয়ায়। চলল কান্নার পাল্লা দেওয়া আরামে। তারপর কেঁদে সন্তুষ্ট হয়ে দুজনে দুজনের মুখের দিকে

চেয়ে হাসি। সে হাসিও নিরর্থক হাসি। বোধ হয়, শুধু একটু লজ্জার খাদ থাকত সে হাসিতে। শুধু শুধু চোখের জলে দুজনে দুজনের বুক মাথা ভেজানোর জন্যে লজ্জা। হাসির গমকে কাঁপতে থাকত কংসারি হালদারের গোঁফ জোড়াটা, কাঁপতে থাকত সেই নথটি, নথের নীচের মুক্তাটি দুলতে থাকত।

খুট করে একটু শব্দ হল।

ঘরে ঢুকলেন হালদার মশায়ের বড় ছেলে। ঢুকে তিনি প্রথমে জানলাগুলো খুলতে লাগলেন।

হালদার মশায় একটি নিঃশ্বাস ফেলে আবার চোখ চাইলেন। নাঃ, সত্যিই আর কাঁদবার মত কোথাও একটু আশ্রয় নেই তাঁর। কার কাছে কাঁদবেন তিনি তাঁর কান্না? কেঁদে কার কান্না থামাবেন এখন? কান্নার শেষে কার সঙ্গে মন মিলিয়ে হাসবেন?

বড় ছেলে ত্রিপুরারি হালদার জানলাগুলো খুলে দিয়ে বাপের প্রস্রাব-পাত্রটা খাটের পাশের টুলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেজো ছেলে তারকারি ঘরে ঢুকল এক বালতি জল আর একখানা সাদা গামলা নিয়ে। কংসারি হালদার মশায় চুপ করে দেখতে লাগলেন তাঁর দুই ছেলেকে। বহুদিন পরে এই কয়েকটা দিন তিনি বেশ ভাল করে আর অনেকক্ষণ ধরে দেখছেন তাঁর দুই ছেলেকে। সত্যিই ওরা এতবড় হয়ে উঠেছে এ তিনি এতদিন সত্যিই খেয়াল করেন নি। রোজই প্রায় এক-আধবার দেখতে পেতেন তিনি ছেলেদের। রোজ সকালে যখন ওরা দাড়ি কামাত, ছোটাছুটি করে সাজ-পোশাক পরত বা আপিস বেরিয়ে যেত, সেই সব সময় তিনি হয়তো এক পলক দেখতে পেলেন কাউকে। সন্ধ্যার পর ওরা যখন ফিরত বাড়িতে তখন তো তিনি থাকতেন তাঁর নিজের ঘরে বন্দী হয়ে, তখন তাঁর দুই চোখে আঁধার ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না তিনি। কংসারি হালদার মশায় সত্যিই বেশ ঘাবড়ে গেলেন। এঃ, ছেলে

ছুটোও যে তাঁর বুড়ো হয়ে গেছে! এরা তাঁর সেই ছেলে ছুটো, যারা এই বিছানায় তাঁর পাশে শুয়ে জড়াজড়ি করে ঘুমত! এই ভারিক্কী চালের ভদ্রলোক ছুজন হল তপু আর তারু? কী আশ্চর্য!

মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছেন শ্রীতারকারি হালদার, মাননীয় সরকার বাহাদুরের একজন উঁচুদরের হিসাব-পরীক্ষক। তাঁর গলায় ঝুলছে একগোছা সাদা পৈতে, যে ধুতিখানা পরে আছেন তার কোঁচাটা খুলে বেশ করে ভুঁড়িটা বেঁধে নিয়েছেন। দাঁত মাজার গুঁড়ো নিজের হাতে ঢেলে বাপের আঙুলটা তাতে লাগিয়ে দিলেন। কংসারি হালদার মশায় সেই আঙুল মুখে পুরে অনর্থক মাড়িতে একবার বুলুলেন। তখন কাচের বাটিতে করে বাপের মুখের মধ্যে একটু একটু জল দিতে লাগলেন তারকারি হালদার। সেই জল কুলকুচো করে ফেলবার জন্যে আর একটা পাত্র এগিয়ে ধরতে লাগলেন মুখের কাছে। খুব সাবধানে খুব সন্তর্পণে সব কাজ চলতে লাগল। ইতিমধ্যে বড় ছেলে ফিবে এলেন আবার। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর স্নান হয়ে গেছে, মাথার সামনেব টাকটা ভাল করে মোছারও সময় পান নি। স্নান করে একখানা গরদ পবে কাঁধে ভিজে গামছা নিয়ে বাপের কাপড় হাতে করে ছুটে এসেছেন। তারপর ছু ভাযে বাপের কাপড বদলালেন। বিছানা ঠিক কবে দিলেন। একজন চাকর এসে ঘর মুছে বালতি গামলা ছাড়া কাপড় সব বার কবে নিয়ে গেল। সব কাজ নিঃশব্দে চলতে লাগল। অবশেষে ঘবেব কোণেব এক কুলঙ্গি থেকে ছোট্ট একটি তামার কমণ্ডলু এনে বড ছেলে এক ছিটে জল দিলেন বাপের হাতে। হালদার মশায আঙুলে পৈতে জড়িযে বুকের ওপর হাত রেখে চোখ বুজলেন।

সেই ফাঁকে ছুই ভাইয়ের চোখে চোখে কী কথা হয়ে গেল! ছুজনেই ছুজনেব দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়লেন. হালদার মশায়ের জপ শেষ হল, তিনি ছু হাত জোড় কবে কপালে ঠেকালেন।

তখন ছোট ছেলে তারকারি একটা ঢোঁক গিলে বললেন, “আজ আমাদের পালা বাবা।”

কংসারি হালদার একটু যেন চমকে উঠলেন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন কড়িকাঠের দিকে। শেষে তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠল, তিনি কিছু বলছেন কি না তা শোনবার জন্যে দুই ভাই ঝুঁকে পড়লেন তাঁর বিছানার ওপর। শোনা গেল হালদার মশায় বললেন, "তোশকের তলায় চাবি আছে, নিয়ে লোহার সিন্দুকটা খোল। তোমাদের মায়ের দু-একখানা গয়না এখনও আছে। নিয়ে বেচে পালার টাকাটা দিয়ে দাওগে।"

বড় ছেলে ত্রিপুরারি বললেন, "টাকা কাল সকালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে বাবা।"

এবার হালদার মশায় সত্যিই বেশ চমকে উঠলেন, "হয়ে গেছে! কে দিলে?"

"এ তো আমাদের পালা বাবা, আমরাই দিয়েছি।" ছোট ছেলে বললেন।

"তোমরা দিয়েছ! মানে তোমরা পালা চালাবে?" হালদার মশায় যেন আঁতকে উঠলেন।

বড় ছেলে, যেমন সুরে শিশুকে সান্ত্বনা দেয়, সেই সুরে বললেন, "আমাদের পালা আমরা চালাব না তো কে চালাবে বাবা? আমি তো চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। এখন ছ মাস ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছি। ছুটি ফুরলে আর কাজে যোগ দেব না। বছর পাঁচেক পরে তারকও বেরিয়ে আসবে। বাস্, তখন আর ভাবনা কী!"

ছোট ছেলে বললেন, "দাদা যাচ্ছে মায়ের বাড়ি এখনই, কী করতে হবে বলে দাও ওকে বাবা।"

হালদার মশায় বলবেন কী, দম বন্ধ করে তিনি চেয়ে রইলেন দুই ছেলের মুখের দিকে। কোথায় গেল সেই কোট-প্যাণ্ট-আঁটা সাহেব দুজন! জলজ্যান্ত দুটো হালদারই তো দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে।

বেশ কিছুক্ষণ লাগল এ ধাক্কা সামলাতে তাঁর। তারপর প্রথম যে কথা তাঁর মুখ থেকে বেরল তা আরও আশ্চর্য ব্যাপার।

"তপু যাচ্ছিস মায়ের বাড়ি! পালা করতে যাচ্ছিস? উপোস করে থাকতে হবে যে রে সেই রাত এগারটা পর্যন্ত! চা না খেয়ে তুই থাকবি কী করে?"

হা-হা করে হেসে উঠল তুই ছেলেই। তপু মানে শ্রীত্রিপুরারি হালদার ছোট ছেলের আবদেরে গলায় বললেন, "বাবা মনে করে, আমরা এখনও সেই তপু আর তরুই আছি। উপোস তো করতেই হবে বাবা, তোমার বউমায়েরাও সব উপোস করে থাকবে। আজ প্রথম দিন পালা করতে যাচ্ছি বাবা, কী কী করতে হবে বলে দাও। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি চলে যাই।"

হালদার মশাই আরও কিছুক্ষণ রইলেন চুপ করে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "যা। মায়ের পালা মা নিজেই করে নেয় রে পাগল। আমাদের আর করবার কী আছে! ভটচাজ্জি মশায়ের বাড়িতে ভোগ নৈবেদ্য যেন ঠিক পৌঁছয় আর কাঙালীদের খাওয়াবার সময় যেন কেউ গালমন্দ না দেয়, এইটুকু শুধু নজর রাখিস।"

মায়ের পালা মা নিজেই করে নেয়।

কংসারি হালদার ফলের রস খেয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে মনে মনে আওড়াতে লাগলেন ওই কথাটি—মায়ের পালা মা নিজেই করে নেয়।

বহুবার বহুজনের মুখ থেকে শোনা বহু পুরনো কথাটা অনেকবার আওড়ালেন তিনি মনে মনে। আর জ্বলতে লাগল তাঁর বুকের ভেতরটা। একটা মোক্ষম সংবাদ শোনার জন্যে তাঁর চোখ কান মন সব উন্মুখ হয়ে রইল।

একটু পরেই মায়ের মন্দিরের কাজ সেরে ভটচাজ্জি মশায় আসবেন এ বাড়িতে। তেতলায় উঠে লক্ষ্মীনারায়ণের নিত্যসেবা করবেন। আর তখনই জানাজানি হবে ব্যাপারটা। তারপর এই সংসারে কী ঘটবে আর কী ঘটবে না তা একমাত্র ওই মা-কালীই জানেন।

কংসারি হালদার মশায় ঘামতে লাগলেন। এগিয়ে আসছে সেই মোক্ষম ক্ষণটি। ওই মায়ের বাড়িতে ঢাক বেজে উঠল। প্রথম বলি হয়ে গেল। মায়ের নিত্যপুজোও শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণে। এলেন বলে ভটচাজ্জি মশায় খড়ম খট খট করে।

সত্যিই তিনি খড়মের শব্দ শুনতে পেলেন সিঁড়িতে। হালদার মশায় দুই চোখ যতটা সম্ভব মেলে চেয়ে রইলেন দরজার দিকে। আজকাল ভটচাজ্জি আগে তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁকে দেখে তারপর তেতলায় যান। খড়মের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল তাঁর ঘরের দিকেই।

মুহূর্তের মধ্যে হালদার মশায় মতলব ঠিক করে ফেললেন।

ঘরে ঢুকলেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য মশায়।

"কেমন আছ আজ কাঁসারি?" কংসারি হালদারকে যাঁরা নাম ধরে ডাকতেন তাঁরা কাঁসারিই বলতেন।

"ভাল, সরে এস ভটচায, একটা কথা বলি তোমাকে।" চাপা গলায় বললেন হালদার মশায়।

"ত্রিপুরারি গেছে মায়ের বাড়িতে। কী মানান মানিয়েছে যদি দেখতে কাঁসারি! গরদ-পরা ধবধব করছে বর্ণ, আমি কপালে বেশ করে লেপে দিয়েছি মায়ের কপালের সিঁদুর, দাঁড়িয়েছে তোমার ছেলে মায়ের দরজায়। আঃ, কী মানান মানিয়েছে! যদি দেখতে কাঁসারি চোখ জুড়িয়ে যেত তোমার। ছেলে-ভাগ্য করেছিলে বটে তুমি।" ভটচায মশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

কংসারি হালদার ফিসফিস করে বললেন, "কিন্তু ভটচায, মায়ের যন্ত্রটা বোধ হয় ওপরে গিয়ে আর দেখতে পাবে না তুমি।"

"অ্যাঁ! কী বললে! কেন!" চোখ কপালে উঠল ভটচাযের।

চোখ বুজে বেশ ধীরে ধীরে আওড়ে গেলেন কংসারি হালদার, "মা আমায় স্বপ্নে কাল বলে গেল ভটচায যে—" থামলেন হালদার মশায়।

"কী বলে গেল তোমায় মা?" প্রায় ধমকের মত শোনাল ভটচাজ্জি মশায়ের সুর, "কী তোমায় বলে গেল আবার স্বপ্নে?"

আরও আস্তে আস্তে কোনও রকমে হালদার মশায় বললেন, "আমি চললুম এ বাড়ি থেকে।"

"অ্যাঁঃ!"—মিনিট খানেক চেয়ে রইলেন ভটচায মশাই হালদার মশায়ের মুখের দিকে। তারপর খড়ম ফেলে রেখে শুধু পায়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। তেতলার ঠাকুর-ঘরের দরজার শিকল পড়ল আছড়ে। আওয়াজটা চেনেন হালদার মশায়। তিনি শুধু ঘামতে লাগলেন শুয়ে শুয়ে।

আর ঠিক তখন অঝোরে চোখের জল ঝরে পড়ছে একখানি ছোট্ট পাথরের ওপর ফিনকির মায়ের দুই চোখ থেকে। হতভম্ব ছেলেমেয়ে ফনা আর ফিনকি চেয়ে আছে হাঁ করে মায়ের দিকে। থরথর করে কাঁপছেন তাদের মা। আধো-অন্ধকার সেই টিনের খুপরির দরজার সামনে দু হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ফনা-ফিনকির মা। তাঁর জোড়হাতে একখানি নীল রঙের চৌকো পাথর। পাথরখানি ইঞ্চি দেড়েক লম্বা চওড়া, বোধ হয় আধ ইঞ্চিটাক পুরু। ওপরটা চুড়োর মত। বেশ নজর দিয়ে দেখলে দেখা যায়, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আগুন জ্বললে যেমন দেখায়, তেমন একটু আলো ফুটে বেরচ্ছে পাথরের ভেতর থেকে।

অনেকটা সময় লাগল মায়ের সামলাতে। তারপর তিনি চুপি চুপি কোনও রকমে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় পেলি এটা তুই ফিনকি ? কোথায় পেলি এ জিনিস ? ঠিক করে বল্ মা, ঠিক করে বল্।"

বলবে কী ফিনকি, গলা দিয়ে স্বর বেরলে তো বলবে। মায়ের অবস্থা দেখে তার চোখ কপালে ওঠার যোগাড় তখন। কে জানত যে ওই পাথরের টুকরোটা হাতে পেলেই মায়ের এ রকম মরমর অবস্থা হবে !

আগের দিন সন্ধ্যেবেলা কাগজে মোড়া শক্ত মত জিনিসটা যখন সে ছোঁড়া তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সাঁ করে সরে পড়ল, তখন কি সে জানত যে কী অলক্ষুণে জিনিস সে পেটের কাছে গুঁজে বাড়ি নিয়ে আসছে ! তারপর রাতে আর কাগজ খুলে জিনিসটা দেখার ফুরসতই পেলে না ফিনকি, খাওয়াদাওয়ার পরে আলো নিবিয়ে দিলে মা। সকালে উঠে যখন মনে পড়ে গেল ফিনকির, তখন কাগজ খুলে দেখে ওই পাথরের টুকরোটা। পাথরের টুকরো না পাথরের টুকরো, তবে দেখতে বেশ। ফিনকি ওখানাকে তুলে রেখে দিয়েছিল বাসনের চৌকির কোণে।

ভেবেছিল, ঘর মুছে বাসন মেজে কাপড় ছেড়ে এসে ওখানা সরিয়ে রাখবে কোথাও, কোনও বাক্সের ভেতরে ফেলে রাখবে। মা যে এর মধ্যে ওখানা দেখে ফেলবেন আর দেখেই অমন ভাবে চিৎকার করে উঠে কাঁদতে লাগবেন, এ কী করে জানবে ফিনকি!

"এটা এখানে কে রাখলে ?" বলে মা চেঁচিয়ে উঠলেন।

ফিনকি বললে, "আমি ঘর ঝাঁট দিতে দিতে পেলাম ওই কোণায়।"

"কোন্ কোণে ছিল রে ? কোন্ কোণে ?"

বাস্, একেবারে পাগলের মত মা ঠুকতে লাগলেন পাথরখানা তাঁর কপালে। তারপর নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন পাথরখানার দিকে চেয়ে। ব্যাপার দেখে ছেলেমেয়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তাঁর দিকে তাকিয়ে।

শেষে ফনা বলবার মত কথা খুঁজে পেলে একটা। হাত পাতলে মায়ের সামনে।

"দাও তো মা, দেখি কী ওটা !"

মা তাঁর জোড়হাত বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে লুকিয়ে ফেললেন পাথর খানা। যেন এখুনই ছেলে কেড়ে নেবে তাঁর হাত থেকে। সভয়ে বললেন, "ছুঁবি কী রে! এ জিনিস কি ছোঁয়া যায় যখন তখন! যা, নেয়ে আয় চট করে; তারপর তোর হাতে এটা সঁপে দেব আমি, যা।"

ব্যাপার কী বুঝতে না পেরে নেয়ে আসতে ছুটল ফনা বালতি নিয়ে রাস্তার কলে। আড়তে যেতে দেরি হবে তার। হোক, তবু সে দেখে যাবে জিনিসটা কী!

তখন ফিনকির হুঁশ হল। বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা হতে চলল তো! জিনিসটা যাই হোক, কিন্তু পেয়েছে সে। দাদার হাতে সঁপে দেবার মানে ?

ফুঁসে উঠল ফিনকি।

"দাও তো মা দেখি, কী ওটা !"

মা রেগে গেলেন।

"তুই ছুঁবি এটা! তোর ছুঁতে আছে এ জিনিস ? জানিস তুই, কী জিনিস এ ?"

ফিনকিও রেগে গেল। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, "জানবার দরকার নেই আমার। আমি ওটা পেয়েছি, ওটা আমার জিনিস, দাও, আমায়।"

মাও চেঁচিয়ে উঠলেন, "কী বললি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তোর জিনিস এটা! তুই পেয়েছিস বলে তোর হাতে দিতে হবে?"

হঠাৎ যে কী হল ফিনকির, ঝাঁপিয়ে পড়ল সে মায়ের গায়ে। দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠল, "দেবে না তুমি? আমার জিনিস, আমি পেয়েছি, দেবে না আমায়?"

অতি অল্প সময় সামান্য হুটোপটি হল মায়ে ঝিয়ে। হঠাৎ ফিনকি দরজা টপকে বারান্দা ডিঙিয়ে আছড়ে পড়ল উঠনে। চোখে অন্ধকার দেখল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠে বসে কপালে হাত দিয়ে দেখল হাতটা চটচট করছে। হাতখানা নামিয়ে মেলে ধবল চোখেব সামনে, টকটক করছে লাল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। চেয়ে দেখল ঘরের দিকে, মা দাঁড়িয়ে আছেন দবজার চৌকাঠ ধরে, তাঁর দুই চোখে আগুন জ্বলছে।

ফিনকির গলা থেকে বেবল একটা অস্পষ্ট গজন, "আচ্ছা।"

তারপর সে আঁচলটা কপালে চেপে ছুটে বেবিযে গেল বাড়ি থেকে।

এ-গলি ও গলি সে-গলি দিযে ছুটতে লাগল ফিনকি। শেষে বেরিয়ে এল রাস্তায়। গলির মধ্যে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তবু একটু আড়াল ছিল। গলি হল অন্ধ, কিন্তু রাস্তার সহস্র চোখ। গলিতে ছুটে চলা সম্ভব, কিন্তু রাস্তায় সহস্র চোখের চাউনিকে অবহেলা করে ছোটা কিছুতেই সম্ভব নয়। গলির ভেতর ঠেলে গুঁতিযে পথ কবে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু রাস্তার বুকে নিজের পথ নিজে করে না নিলে কোথাও পেঁীছনো সম্ভব নয়।

ছোটা বন্ধ করে হনহন করে হাঁটতে লাগল ফিনকি। চেয়েও

দেখল না মায়ের বাড়ির দিকে। কোথায় যাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, এসব চিন্তা একটি বারের জন্যও মনের কোণে উদয় হল না তার। বাঁ হাতে আঁচলের খুঁট চেপে আছে কপালে। ডান হাত দিয়ে মাঝে মাঝে চোখের ওপর থেকে চুলগুলো ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। পা কিন্তু থামাচ্ছে না কিছুতেই। ফিনকি হাঁটছে।

রাস্তা, কালীঘাটের কালীবাড়ি যাবার পথ। দস্তুরমত তীর্থপথ। যে তীর্থপথের প্রতিটি ধুলিকণাই অতি পবিত্র। কিন্তু ধুলিকণার সাক্ষাৎ মেলে না কালীতীর্থ-পথে। পায়ের নীচে যা লাগে তা হল কালো কাদা। সিমেণ্ট পানের পিচ দিয়ে বাঁধানো রাস্তার বুকে মাটি নেই। যা আছে তাব নাম পথের কালি। পিছল প্যাচপ্যাচে কালীবাড়ির পথে পথের কালি গায়ে মুখে সর্বাঙ্গে না মেখে কার সাধ্য এগোয়! রোজ জল দিয়ে দু বেলা ধোয়া হয় সে পথ, কাজেই ধুলো থাকবে কী করে সে পথে। ধুলো না থাকলেও, গড়াগড়ি খাওয়াটা আটকায় না। একটু অসাবধান হলেই পতন। ষাঁড় গরু ছাগল কুকুর সাধু ফকির চোর গাঁটকাটা ফেরিওয়ালা ডালাধরা ঘাটের বামুন কুঠে ভিখিরী খদ্দের-ধরা মেয়েমানুষ আর গৃহস্থ ঘরেব বউ ঝি গিজগিজ কবছে সেই তীর্থপথে। তার মধ্যে একটু অন্যমনস্ক যে হচ্ছে তার আব পবিত্রাণ থাকছে না। তীর্থপথেব কালো পিচেব ওপর পবিত্র ধুলো-গোলা কালো কালিতে গড়াগড়ি দিয়ে উঠতে হচ্ছে।

ফিনকিও পরিত্রাণ পেল না।

একটি ষাঁড় একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমনো অভ্যাস কবেছিল। রোজই বেচাবা বেলা বারোটাব আগে উঠতে পারে না শয্যা ছেড়ে। পার্কের গায়ের ফুটপাথে আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে সে নাক ডাকাচ্ছিল। তার সঙ্গিনী দাঁড়িয়ে ছিল তার পাশেই। সে বেচারা বোধ হয় সূতিকায় ভুগছে, অনবরত তার পেছনের পা আব লেজ বেয়ে পাতলা ময়লা গড়িয়ে নামছিল। ফলে ফুটপাথের সেই জায়গাটায় এমন পিছল হয়েছিল যে, ইঁদুরের পা পড়লেও হড়কাবে। ষাঁড়ের এপাশে ওপাশে পার্কের রেলিং ঘেঁষে ঘর-কন্না সাজিয়ে বসে ছিল কয়েকটি কুঠে পরিবার।

তাদের ছেলেপিলেদের পাছে মাড়াতে হয় এই ভয়ে সকলে ফুটপাথের *কিনারাটুকুই ব্যবহার করছিল। কিন্তু সেই হাতখানেক জায়গাতেও* ষাঁড়ের সঙ্গিনীর সূতিকা রোগের ফল ফলেছে। যেই সেখানে পা পড়া অমনি ঠিকরে পড়ল ফিনকি ফুটপাথের ধারের নর্দমার ওধারে এক গাদা কাটা কাপড়ের ওপর। ফুটপাথে স্থান না পেয়ে রাজ্যের জিনিসপত্র সাজিয়ে বসেছে ব্যাবসাদাররা রাস্তায়। ছোট ছোট খেলনা বাসন ছুরি কাঁচি গামলা গামছা মোটর টায়ারের স্যাণ্ডেল কাটা কাপড় সব রকমের মাল ঢেলেছে ফুটপাথের ধারে রাস্তায়। ফিনকির কপাল ভাল যে সে পড়ল কাটা কাপড়ের গাদায়। ছুরি কাঁচি বাসনকোসনের ওপর পড়লে আর একবার রক্ত ছুটত তার কপাল থেকে।

তেলে-বেগুনে তিড়বিড়িয়ে উঠল কাপড়ওয়ালা। সে বেচারা সবে এসেছে চিতোরগড় থেকে। বড়বাজারের দোকানে দোকানে ঘুরে নানা রঙের টুকরো ছিট যোগাড় করেছে। মনে তার আগুন জ্বলছে, বড়বাজার ঘুরে জাত-ভাইয়েদের সাত-আটতলা বাড়ি আর গদি দেখে তার রক্তে তোলপাড় লেগে গেছে। টুকরো বেচার অবসান হবে থান থান কাপড় বেচায়, তারপর গিয়ে পৌছবে গাঁট বেচা পর্যন্ত। শেষে একেবারে খুলে বসবে কাপড়ের মিল একটা, এই হল তার স্বপ্ন। সে স্বপ্ন এ ভাবে ভেঙে যাবে শুরুতেই, কোথাকার একটা কে আছড়ে এসে পড়বে তার টুকরোর ওপর, এ'সে সহ্য করবে কেন! হাতে ছিল এক গজী একখানা লোহার শিক, আঁতকে উঠে সে শিকখানা উচিয়ে ধরল ওপর দিকে। বাস্, হা-হা-হা-হা করে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাস্তাসুদ্ধ মানুষ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কিল চড়ে থেঁতো হয়ে গেল চিতোরগড়ের বীর। ছিটের টুকরোগুলো উধাও হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। লোহার শিকের বাড়ি মেরে মেয়েছেলের মাথা ফাটানো, একেবারে রক্ত বার করা—এ তো যা-তা কাণ্ড নয়। বারোয়ারী মার-ধাক্কার চোটে এক মুহূর্ত সে তিষ্ঠতে পারল না। ছিটের টুকরো ছিট মাপবার লোহার শিক সব ফেলে সে ছুটতে লাগল। তাতেও কি নিস্তার আছে, কালীঘাটের ত্রিসীমানা ছাড়াবার জন্যে এক দল মানুষ ছুটতে লাগল তার পেছনে।

ইতিমধ্যে ফিনকি পৌঁছে গেল হাত কয়েক দূরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভেতর। চোখ চাইবার আগেই কারা তাকে তুলে ফেললে কাপড়ের গাদা থেকে, হাঁ করবার আগেই সে বুঝতে পারলে যে তার মাথা কপাল পেঁচিয়ে বাঁধা আরম্ভ হয়ে গেছে। ছাড়া পেয়ে সে দেখল যে যারা তাকে ডাক্তারখানায় পৌঁছে দিয়ে গেল তাদের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। সুতরাং কী আর করবে ফিনকি তখন, ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথা নিয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল আবার ফুটপাথে। পাশেই একটা পান-বিড়ির দোকান, দোকানের আয়নায় ফিনকি দেখতে পেল নিজের ছায়া। একটু এগিয়ে গিয়ে ভাল করে সে দেখে নিলে নিজেকে। বাঃ, একেবারে চেনাই যাচ্ছে না তাকে! কান মাথা ফরসা কাপড় দিয়ে পেঁচানো ওই মেয়েটাই যে ফিনকি, তা সে নিজেই সহজে বিশ্বাস করতে পারল না।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হল ফিনকি। সহজে কেউ আর তাকে চিনতে পারবে না ভেবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। কিন্তু কাপড়ময় কাদা আর রক্তের দাগ। কাপড়খানার সঙ্গে মাথার ফরসা ব্যাণ্ডেজটা একেবারে বেমানান দেখাচ্ছে। তা আর করবে কী ফিনকি, ফরসা কাপড় এখন জুটছে কোথা থেকে! মনে মনে হিসেব করে দেখলে সে, এখনও তিনখানা কাপড় তার রয়েছে বাক্সে। তার মধ্যে একখানা একটু ছেঁড়া, কিন্তু পরা চলত আরও অনেক দিন। যাক্ গে চুলোয় সে সব কাপড়-চোপড়, যার ইচ্ছে পরুক এখন তার জামাকাপড়। ফিনকি আর ওমুখো হচ্ছে না।

উত্তরমুখো এগিয়ে চলল সে। আবার না আছাড় খায় এই ভয়ে সাবধানে হুঁশ রেখে লোকের ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলল। চেনা লোকের সামনে পড়বার ভয় নেই আর, পড়লেও কেউ চিনতে পারবে না তাকে। কান মাথা ভুরু পর্যন্ত এমন ভাবে ঢাকা পড়েছে যে ফিনকি নিজেই নিজেকে চিনতে পারছে না পান-বিড়ির দোকানগুলোর আয়নায়। কিন্তু কানে যেন কম শুনছে সে, আর তেষ্টাও পেয়েছে তেমনি। আঙুল দিয়ে ঠেলে ঠেলে কানের ওপর থেকে কাপড়টা খানিক ওপরে তুলল। এবার

বেশ শুনতে পাচ্ছে সব। কিন্তু তেষ্টা পেয়েছে তার খুবই, একটা কল পেলে এক পেট জল খেয়ে নিতে পারত। *নজর রেখে চলতে লাগল ফিনকি, একটা কল দেখতে পেলে হয়।*

বাজার ছাড়িয়ে গেল ফিনকি। বাজারের সামনে রাস্তার ওপর পেঁপে-কমলা-কলা-সাজানো দোকানগুলোর সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল সে। কমলা দেখে মনে হল তার অনেক কষ্টে জমানো পয়সাগুলোর কথা। কত জমেছে কে জানে, দু-তিন টাকাও হতে পারে হয়তো! চার পয়সা দিয়ে ছেঁদা করা একটা মাটির লক্ষ্মীর ঝাঁপি কিনে সেই ছেঁদার মুখে যখন যা পেরেছে ফেলেছে ফিনকি। অনেক দিন ধরে ফেলছে, সেই স্নানযাত্রার দিন থেকে। চার-পাঁচ টাকাও থাকতে পারে। যদি দু আনা পয়সাও থাকত এখন কাছে, ফিনকি একটা কমলা কিনে খেত। এখন সেটা ভেঙে পয়সাগুলো নিয়ে দাদা রেস খেলবে। খেলুক গে, গোল্লায় যাক সে পয়সা, ফিনকি আর ওমুখো হচ্ছে না।

কিন্তু কল কোথায়!

জলের কলও কি নেই নাকি এধারে?

আর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে গলির ভেতর একটা কল দেখতে পেল ফিনকি। অনেকগুলো বালতি ঘড়া জমে রয়েছে সেখানে, নানা রঙের কাপড় পরে অনেকগুলো মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে আছে। থাকুক গে, কারও দিকে না চেয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। সত্যিই তার ছাতি ফাটছে তখন তেষ্টায়। একটা ঘড়া বসানো ছিল কলের মুখে, ঘড়াটা ভরতি হতে আর এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমি একটু জল খাব।"

ভয়ানক মোটা ভয়ঙ্কর কালো একটা মেয়েমানুষ কোমরে একখানা আর গায়ে একখানা গামছা জড়িয়ে ঘড়াটা তুলে নিচ্ছিল। হঠাৎ একেবারে তেড়ে কামড়াতে এল ফিনকিকে।

"আহা-হা, কোথা থেকে মরতে এল রে ঘেয়ো কুত্তিটা, জল খাবার আর ঠাঁই পেলে না কোথাও! উনি এখন এঁটো করে যান কলতলাটা, আবার আমি ছিষ্টি ধুয়ে মরি আর কি!"

পেছন থেকে কে বলে উঠল, "আহা, দাও না গো একটু জল খেতে মাসী, দেখছ না মাথা ফাটিয়ে এসেছে।"

আর যাবে কোথা, একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেল। মাসী গায়ের গামছাখানা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে এল হাঁ করে।

"তবে র‍্যা হারামজাদীরা, আমি কলে এলেই যত ধম্মজ্ঞান তোদের চাগিয়ে ওঠে, না ?"

হারামজাদীরাও ছেড়ে কথা কবার পাত্রী নয় কেউ। চক্ষের নিমেষে এমন কাণ্ড বেধে গেল যে জল-তেষ্টা ভুলে পিছিয়ে যেতে হল কয়েক পা ফিনকিকে। কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে, গলির মুখের একটা চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। লোকটা যেমন জোয়ান তেমনি তার চোখ ছুটো আর গোঁফ জোড়াটা। পরে আছে একটা রঙচঙে লুঙ্গি আর একটা ফতুয়া। লুঙ্গিটা গুটতে গুটতে এগিয়ে গেল সে কলের দিকে। গিয়েই সর্বপ্রথম লাথি মেরে মেরে ঘড়া বালতি-গুলোকে ছিটকে ফেললে চতুর্দিকে। তারপর মার, এলোপাতাড়ি চালাতে লাগল তার হাত ছুখানা। মেয়েমানুষগুলো ছুটতে লাগল। চক্ষের নিমেষে তারা অন্তর্ধান করলে ছুদিকের খোলার বাড়ির ভেতর। মোটা মেয়েমানুষটা ছুটতে পারল না। পেছন থেকে তার চুল ধরে ফেললে সেই লোকটা। চুল ধরেই মার, সে কী কিলের আওয়াজ! কিলের আওয়াজ ছাপিয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগল মেয়েমানুষটা। গামছা ছুখানা খসে পড়ে গেল তার গা থেকে। ধপাস করে সে নিজে পড়ে গেল মাটিতে। তাতেও রেহাই নেই, তখন আরম্ভ হল লাথি। গোটা কতক লাথি মেরে তাকে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে এল সেই লোকটা ফিনকির দিকে।

ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল ফিনকি।

এই সর্বপ্রথম লোকটা কথা বললে। ভয়ঙ্কর গলায় জিজ্ঞাসা করলে, "কে রে তুই ? এলি কোথা থেকে মরতে এখানে ?"

জবাব দেবে কে ? ফিনকির প্রাণ উড়ে গেছে তার চোখের দিকে তাকিয়ে। মুখে আঁচল পুরে সে কান্না চাপতে গিয়ে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

লোকটা একটুখানি চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁকার দিয়ে উঠল, "এবে এ বেষ্টা, এ শালে দেশো, ইধার আয় বে।"

চায়ের দোকান থেকে জন চার-পাঁচ মানুষ বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ফিনকির চার পাশে।

"চিনিস নাকি বে এটাকে?" জিজ্ঞাসা করলে সেই যমের মত লোকটা।

কেউই চেনে না, সবিনয়ে তা নিবেদন করলে তারা।

তখন পেছন থেকে শোনা গেল মেয়েমানুষের গলা। কে বললে, "ও কলে জল খেতে এসেছিল ঘোড়াদা, বেঙা মাসী মুখ করে উঠল।"

"জল খেতে এল এই কলে! এই কলের জল মানুষে খায় নাকি? যত শালী পচা শকুন জল খায় যে কলে সে কলে ও জল খেতে এল কেন?"

ক্রমে চড়তে লাগল ঘোড়াদার গলা। টুঁ শব্দটি নেই আর কোথাও। "আচ্ছা, ঠিক আছে। চল্ বেটী আমার সঙ্গে, জল খাওযাব আমি তোকে।"—বলেই টপ করে তুলে নিলে ফিনকিকে ঘোড়াদা। নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল সেই গলি থেকে। তার হাতের ওপর কাঠ হয়ে রইল ফিনকি, এতটুকু নড়াচড়া করারও সাহস হল না তার।

ঘোড়া পৌঁছল তার আস্তাবলে ফিনকিকে নিয়ে। কোথা দিয়ে কোন্ পথে কতক্ষণ ধরে এল ফিনকি তার হিসেব রাখতে পারে নি। একরকম দম বন্ধ করেই ছিল সে ঘোড়ার হাতের ওপর। নামিয়ে যখন দেওয়া হল তাকে তখন সে দেখল একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলের ওধারে বসে আছেন একজন ভদ্রলোক, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ফিনকি বুক খালি করে নিঃশ্বাস ফেলল। এতক্ষণে এমন একজন মানুষের সামনে সে পৌঁছল যাঁর চোখের দিকে চাইলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় না। সোনার ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তিনি তাকিয়ে রইলেন ফিনকির দিকে। তারপর ঘোড়ার দিকে

মুখ ফিরিয়ে বললেন, "কী গো পালোয়ানজী, এর মাথাটা ফাটল কী করে ?"

"কী করে জানব সে খবর বড়দা ? সত্যপীরতলার কলে গিয়েছিল জল খেতে এ, বেঙা বাড়িউলী তেড়ে কামড়াতে আসে এতটুকু মেয়েটাকে। তখন লাগে চুলোচুলি অন্য মাগীগুলোর সঙ্গে বেঙা বাড়িউলীর। গোলমাল শুনে আমি গিয়ে মেয়েটাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে এলাম।" নরম সুরে জবাব দিলে পালোয়ানজী।

"আর সেই সঙ্গে তাদের ঠেঙিয়ে একটু হাতের সুখ করে এলে, কী বল ?"—বলে হো-হো করে হাসতে লাগলেন সেই ভদ্রলোক। হাসি শেষ হলে বললেন, "হাত তুমি তুলবেই যে কোনও ছুতোয়, একটা ভাল কাজ করতে গিয়েও কাউকে না কাউকে না মেরে থাকতে পার না তুমি। এ স্বভাবটা আর তোমার গেল না শশী। শরীরে শক্তি থাকলেই যদি মেরে বেড়াতে হয় মানুষকে তবে শক্তি না থাকাই বরং ভাল। তা যাক, বোস না শশী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?"

শশীর সুর আরও নরম হয়ে গেল। বসল না সে, ফতুয়ার দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুব মিনতি করে বললে, "না মেরে আমি থাকতে পারি না যে বড়দা। যত মনে করি আর ঠেঙাব না কাউকে তত দুনিয়ার ঝামেলা যেন ঝেঁটিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শালা আমারই ঘাড়ে। যাক, যেতে দাও বড়দা, এখন এ মেয়েটাকে নিয়ে কী করবে বল ? না জেনে খাস সত্যপীরতলার নরকে ঢুকে পড়েছিল একেবারে, ঠিক সময়ে আমার নজরে না পড়লে এতক্ষণে কোথায় যে পাচার হয়ে যেত, কার খপ্পরে যে গিয়ে পড়ত, তাই বা কে বলতে পারে ! এখন একে নিয়ে কী করা যায় তাই বল ?"

ভদ্রলোক তাঁর পাশ থেকে ফোনটা তুলে বললেন, "ব্যবস্থা যা করার করা যাচ্ছে। তুমি কিন্তু এবার তোমার ওই হাত দুটো একটু সামলাও শশী।"

বাড়ি থেকে বেরবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিনকির পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেল। সত্যপীরতলার নাম-করা মুরুব্বী শশী গুণ্ডা ওরফে

ঘোড়াশশী তাকে তুলে নিয়ে যাঁর কাছে পৌঁছে দিল তিনি পাক্কা ব্যবস্থা করার জন্যে যাকে ফোন করতে গেলেন, তাকে তখন না পেয়ে শশীকে বললেন, "এখন আর কাউকে ফোনে পাব না শশী। কোর্ট থেকে আবার আমি ফোন করব। এখন এ মেয়ে রইল আমার এখানেই, দেখি কী করা যায় একে নিয়ে!"

আকর্ণ হাঁ করে কৃতার্থ শশী বলল, "বাস্ বাস্। খাসা ব্যবস্থা হল বড়দা। আমার তো কোথাও চাল চুলো নেই যে সেখেনে নিয়ে যাব ওটাকে। যে সব আড্ডা আছে আমার, সেখানে যত শালা ঘড়েল হাঁ করে রয়েছে। যাক, দরকার পড়লে ঘোড়াশশেকে একটা ডাক দিও বড়দা, আমি চল্লি এখন।" বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শশীর বড়দার পেছনের পর্দা ঠেলে যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁর দিকে চেয়ে হাঁ করে রইল ফিনকি। তারই মত বা তার চেয়ে মাথায় হয়তো একটু বড় হবেন তিনি, কিন্তু তিনি ছোট মেয়ে নন। দস্তুরমত একজন গিন্নীবান্নী মানুষ। কপালে সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা, টকটকে-লালপাড় গরদ পরে আছেন। চোখে মুখে এতটুকু ছেলেমানুষি নেই।

ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, "আরে, এ কে! মাথা ফাটল কী করে?"

বলতে বলতে টেবিলের পাশ দিয়ে এসে একেবারে মাথার ওপর হাত রাখলেন ফিনকির। মুখখানাকে একটু তুলে ধরে বললেন, "এ-হে-হে, রক্ত গড়িয়ে শুকিয়ে রয়েছে যে নাকের ওপর পর্যন্ত! এ রকম হল কী করে?"

শশীর বড়দা বললেন, "যত পার প্রশ্ন করে যাও এক নিঃশ্বাসে। তারপর ওকে নিয়ে যাও বাড়ির ভেতর, সারাদিন ধরে ওই সব প্রশ্নের জবাব বার করে সন্ধ্যেবেলা আমায় জানিও। আমি এখন চললাম কোর্টে।"

"মানে!" আশ্চর্য হয়ে তিনি চাইলেন আবার ফিনকির মুখের দিকে। তারপর তার হাত ধরে বললেন, "সেই ভাল, আমি নিয়ে

যাচ্ছি এক্ষে। তুমি কিন্তু আর দেরি কোর না যেন। চল তো ভাই, চল, তোমার চোখ মুখ ধুইয়ে ভাল করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি আমি।"

আপত্তি করল না ফিনকি, আপত্তি করার সামর্থ্যও ছিল না তার। এমন একজন মানুষ তার হাত ধরবে এ যে স্বপ্নেও কখনও ভাবে নি ফিনকি। শান্ত মেয়ের মত সে চলল তাঁর সঙ্গে, কী রকম একটা মিষ্টি গন্ধে তখন সে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। গন্ধটা আসছিল তাঁর গা থেকেই।

আচ্ছন্নের মত কাজকর্ম সব করে গেলেন ফনা-ফিনকির মা। বাসন কখানা না মেজেই মেয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে, একটু কিছু হলেই বাড়ি থেকে ছিটকে বেরয়। এবার আসুক ফিরে, বাড়ি থেকে বেরনো জন্মের মত বন্ধ করবেন তিনি মেয়ের।

যা হারিয়ে তিনি পথের ভিখিরী হয়েছিলেন সে বস্তু আবার ফিরে এল তাঁর হাতে। এবার আবার দিন ফিরবে। ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি এবার চলে যাবেন কালীঘাটের ত্রিসীমানা ছেড়ে। আড়তের দাঁড়িপাল্লা আর ছুঁতে হবে না তাঁর ছেলেকে, মেয়েকে তিনি চৌকাঠ পেরতে দেবেন না কখনও। অত রাগ মেয়ের, এবার নিজে থেকেই কমবে। রাগ হবে না কেন ? পেট ভরে খেতে পায় না, পরনের কাপড় পায় না, মাথায় একটু তেল পর্যন্ত পায় না। জন্মদুখিনী মেয়েটা তাঁর, তবু মেয়ে একটুও বেচাল হয় নি। চারটে পয়সা হাতে পেলেও তাঁর হাতে এনে তুলে দেয়। নিদারুণ অভাবের তাড়নায় হাত পেতে নেনও তিনি মেয়ের ভিক্ষে-করা পয়সা। কিন্তু আর না, এই শেষ হল তাঁর দুর্দশার দিন। ফিরবেই দিন এবার, ঠিক আগের মত হবে সব-কিছু। কী করে হবে তা অবশ্য তিনি বলতে পারেন না। কিন্তু হবেই, ও জিনিস ঘরে থাকলে ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকেন। কখনও এর অন্যথা হয় না, হতে পারে না।

মনে মনে তিনি আর একবার প্রণাম করলেন সেই পাথরখানিকে। ছেলে স্নান করে আসতে তাকে দিয়ে তিনি স্নান পুজো করিয়েছেন সেই পাথরখানির। তারপর ছেলের হাত দিয়েই সেখানিকে ফুল বেলপাতা তাম্রকুণ্ডসুদ্ধ বাক্সের মধ্যে রাখিয়ে বাক্সে চাবি দিয়েছেন। চাবি ঝুলছে তাঁর আঁচলে, সুতরাং নিশ্চিন্ত আছেন তিনি। এখন মেয়েটা ফিরলে হয়। ফনা বোনকে খুঁজতে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি মানা করলেন। কী হবে সাধতে গিয়ে, সাধলেও সে আসবে না যতক্ষণ না রাগ পড়বে।

ফনাকে বলে দিয়েছেন তিনি, একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে আর বিকেলে ছুটি নিয়ে আসতে। বিকেলে তিনি ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে বসিয়ে বলবেন যে কী জিনিস ফিরে পেল আজ তারা। তাদের বংশের চোদ্দ পুরুষ ওই সাক্ষাৎ কালীর সেবা করেছে। ওই আসল কালীযন্ত্র, নীল পাথরের ওপর খোদাই করা রয়েছে মায়ের যন্ত্র। ফনা-ফিনকির মা চেনেন ওর সব কটা দাগ, তাঁর শ্বশুর তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। ঠিক মাঝখানে একটি বিন্দু, বিন্দুকে ঘিবে পর পর পাঁচটা ত্রিকোণ, ত্রিকোণ ঘিরে অষ্টদল পদ্ম আর অষ্টদল পদ্ম ঘিরে চতুর্দ্বারযুক্ত চারকোণা বন্ধনী। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ লাভ হয় ওই যন্ত্রের সেবায়। ছিলও তাঁর শ্বশুরকুলে লক্ষ্মী-সরস্বতী বাঁধা। কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেল যেদিন ওই যন্ত্র নিয়ে ভিটে ছেড়ে নামতে হল পথে। তারপর ওই সাক্ষাৎ মা-কালীকে অবজ্ঞা করে যেদিন এই বংশের ছেলে কালীঘাটের কালীর দরজায় পয়সা কুড়তে গেল সেদিন এই বংশের কুললক্ষ্মীও হাতছাড়া হলেন। আবার নিজের ইচ্ছেয় ফিরে এসেছেন মা, সুতরাং আবার সব হবে। হয়তো—

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন ফনা ফিনকির মা। তাঁর হাত দুটো একটু থামল কাজ করতে করতে। বেশ আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ। হয়তো—পর্যন্ত ভেবে তার পরের ভাবনাটা ভাবতে আর সাহস হল না তাঁর। থাক্, যেখানে সে আছে, শান্তিতে থাক্। ফিরে এলে এখন কী যে হবে আর কী কী যে হবে না তার সবটুকু কল্পনা করার সামর্থ্যও নেই তাঁর। তার চেয়ে সুখে থাক্ সে, যেখানে আছে সেখানে যেন একটু শান্তি জোটে তার কপালে। তাঁর কপালের সিঁদুর আর হাতের নোয়া নিয়ে যদি তিনি মরতে পারেন তা হলেই তাঁর যথেষ্ট পাওয়া হল জীবনে। কালীঘাটের কালীদ' থেকে যদি তিনি কখনও উদ্ধার পান, ছেলেমেয়ে দুটোকে যদি এই বংশের ছেলেমেয়ের মত দাঁড় করাতে পারেন তিনি কখনও, তা হলে মরেও তিনি শান্তি পাবেন। বেঁচে থাকতে তাঁর কপালে সুখ শান্তি জুটল না, তার জন্যে কখনও তিনি কাউকে স্বপ্নেও দায়ী করেন নি। শেষের দিন কটাও নিজের পোড়া অদৃষ্ট ছাড়া আর কাউকে তিনি দোষ দেবেন না।

কিন্তু এখনও তো ফিরল না মেয়ে ! এত দেরি তো সে করে না কোনও দিন ! বারোটা বোধ হয় বেজেই গেল !

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে ফিনকির মা আর একবার দরজার দিকে তাকালেন।

সত্যিই বেজে গেল বারোটা।

হালদার মশায় অনেকক্ষণ একভাবে চেয়ে আছেন দরজাটার দিকে। প্রতি মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটার প্রতীক্ষা করছেন তিনি ওই দরজার বাইরে। আবছা একটা ছায়া পড়বে বাইরের বারান্দায়, ক্রমে ছায়াটা এগিয়ে এসে দাঁড়াবে তাঁর দরজায়, তারপর ঘরে ঢুকে পড়বে। ঘরের মধ্যে ছায়াটা আর থাকবে না, কথা বলে উঠবে। বলবে, "চল, তোমায় তুলে নিয়ে যেতে এসেছি যে আমি। আর এখানে এমন ভাবে একলা তোমার পড়ে থাকা চলবে না।" শুনে হালদার মশায় হাসবেন, নিঃশব্দে একটু হাসবেন শুধু। সে হাসির মানে কি সে বুঝতে পারবে ! বুঝবে কি সে যে অনেক দেরি হয়ে গেল, একেবারে বারোটা বেজে গেল এই ডাকার ক্ষণটি এসে পৌঁছতে। হালদার মশায়ের হাসি কি এ বারতা বলতে পারবে তাকে, ঠিক সময় ঠিক ডাকটি না দিতে পারলে সাড়া পাওয়ার এতটুকু সম্ভাবনা থাকে না আর। তেল ফুরবার পরে পিদিমটা জ্বলেও যদি আরও কিছুটা সময়, তা হলে তা থেকে শুধু খানিক বিকট গন্ধই বেরয়। তখন সে পিদিমের কাছ থেকে আলোর আভা আশা করা শুধু অন্যায়ই নয়, সেটা সেই বুক-জ্বলন্ত পিদিমটাকে মুখ ভেংচানোর সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু বারোটাও যে কতক্ষণ পার হয়ে গেল !

আর একটু পরেই যে আঁধার ঘনিয়ে উঠবে তাঁর দুই চোখে। তারপর যে ছায়াটুকুও আর দেখতে পাবেন না তিনি। তখন তিনি বোঝাবেন কী তাকে তাঁর বোবা চাউনি দিয়ে ! মুখ ফুটে তো আর কিছু বলতে পারেন না হালদার মশায়। অসংখ্যবার অসংখ্য বলার

ক্ষণ এসেছে আর চলে গেছে। হালদার মশায় শুধু চোখের ভাষায় বলতে চেয়েছেন তাকে তাঁর বলার কথাটা, মুখ ফুটে একটিবারের জন্যেও এতটুকু দয়া চান নি তার কাছে। এইভাবে দিনের পর দিন বছরের পর বছর চোখ দুটোকে কথা বলার কাজে ব্যবহার করার ফলেই তিনি হারিয়েছেন তাঁর চোখের আলোটুকু। দিনের আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের আলোও নিভে যায়। কালির সমুদ্রে ডুবে যান তিনি, তলিয়ে যান মৌনতার অতল গহ্বরে। তখন প্রতিটি মুহূর্ত গুনে গুনে কাটে তাঁর আলোর প্রতীক্ষায়। কারণ আলোই হল ভাষা, ভাষাই হল আলো। যেখানে আলো নেই, ভাষাও নেই সেখানে। হালদার মশায় মর্মে মর্মে জানেন যে আলোহীন ভাষাহীন জীবনের নামই মৃত্যু। সে মৃত্যুকে তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে চুষে চুষে পান করছেন। সে মৃত্যুকে ভয় তো তিনি করেনই না, এমন কি ঘৃণা পর্যন্ত করেন না, একান্ত বন্ধুর মত জ্ঞান করেন সে মৃত্যুকে। সেই মৃত্যু-বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে তাঁর মাথার শিয়রে, আর একটু পরেই তাঁকে গ্রাস করবে। আবার তাঁকে উগরে দেবে কাল ভোরে, যখন আকাশের গায়ে আলোর ভাষায় কথা কয়ে উঠবেন আলোর দেবতা।

কিন্তু কই এল না তো সে এখনও!

আলো মুছে যাবার আগে তবে কি আসবে না সে তাঁর সামনে! কিংবা এও কি সম্ভব যে কংসারি হালদারের সামনে এসে দাঁড়াবার বিন্দুমাত্র গরজ নেই আর তার!

সেও কি তা হলে মনে করলে নাকি যে কংসারি হালদার ফুরিয়ে গেছে একেবারে?

কিংবা যা তারা হাতে পাবার আশায় এতকাল সহ্য করেছে কংসারি হালদারকে, সে জিনিস হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে কংসারি হালদার একেবারে মুছে গেল তাদের মন থেকে?

ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হালদার মশায়। আবার ঘামতে লাগলেন তিনি, আবার তাঁর শিরদাঁড়ার মধ্যে যন্ত্রণাটা শুরু হয়ে গেল।

সমস্ত প্রাণটুকু গিয়ে জমা হল তাঁর দুই চোখে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন দরজাটার বাইরে।

শেষ পর্যন্ত একটা ছায়া পড়ল দরজার সামনে। ঘরে ঢুকলেন হালদার মশায়ের বড় বউমা বেদানার রস এক গেলাস হাতে নিয়ে। এইবার নিয়ে সকাল থেকে চারবার আসা হল তাঁর হালদার মশায়ের ঘরে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তিনি শ্বশুরকে যা খাওয়াবার তা খাইয়ে যাচ্ছেন নিঃশব্দে। নিঃশব্দে হালদার মশায় সেবার অত্যাচার সহ্য করে চলেছেন। ঘড়ির কাঁটার মত চলেছে তাঁর সেবা, একেবারে কলের মত চলেছে ছেলে-বউদের কর্তব্য পালন করা। কোনও দিকে এতটুকু ত্রুটি নেই, বিন্দুমাত্র ছিদ্র নেই তাদের আন্তরিকতায়। সেবা আন্তরিকতা আর কর্তব্য পালনের জগদ্দল পাথরটা নির্ঝঞ্ঝাটে গড়িয়ে চলেছে হালদার মশায়ের বুকের ওপর দিয়ে। এতটুকু নড়াচড়া করারও শক্তি নেই তাঁর।

ভিজে তোয়ালের খুঁটে শ্বশুরের ঠোঁট দুখানি অতি যত্নে মুছিয়ে দিয়ে বড় বউমা খালি গেলাসটা হাতে নিয়ে ফিরে চললেন ঘর ছেড়ে। বউমায়েরা কখনও কথা বলেন নি তাঁদের শ্বশুরের সঙ্গে, কখনও মুখ তুলে তাকান নিও শ্বশুরের মুখের দিকে, শ্বশুরের এতটা কাছে কখনও আসতেও হয় নি তাঁদের। এখন স্বহস্তে সেবা করতে হচ্ছে শ্বশুরের। নিখুঁত ভাবে করে যাচ্ছেন তাঁরা যা করার, কারণ যে বংশের মেয়ে তাঁরা সে বংশের মেয়েরা জানে কী করে শ্বশুরের সেবা করতে হয়। দেখে শুনে ভাল বংশের মেয়েই ঘরে এনেছেন কিনা হালদার মশায়, কাজেই কোনও দিকে এতটুকু আক্ষেপ করার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। তবে একটা কথা তিনি ভাবছেন মাঝে মাঝে। ভাবছেন যে তাঁর বউ দুটো বোবা নয় তো! মরতে বসেছেন তিনি, আর কয়েক দিন পরে এই খাটেও তিনি থাকবেন না, তবু এরা তাঁর সঙ্গে এক-আধটাও কথা কয় না কেন? শেষের দিন কটা তাঁর পাশে বসে তাঁর সঙ্গে ভাল মন্দ দুটো কথা বললে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? ওরা কি ওদের শ্বশুরকে কাঠ পাথর লোহা গোছের কিছু মনে

করে নাকি! না, ওরা এই মনে করে যে এ লোকটার সঙ্গে আলাপ করার মত নেই কিছু এই দুনিয়ায়! কেন ওরা এমন ব্যবহার করে ওঁর সঙ্গে?

কেন সকলে ও-রকম ব্যবহার করছে তাঁর সঙ্গে?

কেন?

হঠাৎ ডেকে ফেললেন হালদার মশায় তাঁর বউমাকে, "বড় বউমা!" চৌকাঠের ওধারে এক পা দিয়েছেন তখন বড় বউমা, পা টেনে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। দুই চোখে তাঁর উপছে উঠেছে ভয় আর বিস্ময়। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন তিনি খাটের পাশে। নিচু হয়ে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমায় ডাকলেন বাবা?"

হালদার মশাই তখন বুজে ফেলেছেন তাঁর দুই চোখ। ঠোঁট একটু নড়ে উঠল তাঁর, অস্পষ্ট কণ্ঠে বলতে পারলেন শুধু, "তপু তো ফিরল না মা এখনও!"

অনেকক্ষণ আর কোনও সাড়াশব্দ পেলেন না হালদার মশায়। চোখ মেলে দেখলেন, ঘরে কেউ নেই। মনে মনে হাসতে লাগলেন তিনি। ভয় করে, সবাই তাঁকে বিষম ভয় করে। উত্থানশক্তি রহিত হয়েছে তাঁর, তবু তাঁকে যমের মত ভয় করে সকলে। ভয় পেয়েই পালিয়ে গেল বউটা। জীবনে কখনও শোনে নি তো তাঁর ডাক, তাই ডাক শুনে কী যে করবে বুঝতেই পারল না। ভয় পেয়ে নিঃশব্দে পালিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। যতই এ কথা ভাবতে লাগলেন হালদার মশায়, ততই হাসিতে তাঁব শরীর ঘুলিয়ে উঠতে লাগল। মন মেজাজ বেশ হালকা হয়ে উঠল তাঁর, বহুকাল পরে খুশী হবার মত একটা কিছু পেয়ে খুশিতে হাবুডুবু খেতে লাগলেন তিনি।

ভয় করে সকলে, বিষম ভয় করে এখনও সকলে হালদার মশায়কে। কংসারি হালদার মরে যাবেন যখন, তখনও সকলের ভয় করবে তাঁর নাম শুনলেই—হা-হা।

ভয়ে একেবারে দম বন্ধ হবার উপক্রম হল ত্রিপুরারি হালদারের। সামনে দেখতে পেলেন যাকে, তাকেই সংবাদটা জানিয়ে তিনি ছুটলেন বাড়ির দিকে। মুহূর্ত মধ্যে কালীবাড়িতে রাষ্ট্র হয়ে গেল, শেষ সময় উপস্থিত কংসারি হালদারের। পিলপিল করে মানুষ ছুটল হালদার-বাড়ির দিকে। পঞ্চানন ভট্টাচার্য মশায়ের কাছেও সংবাদটা পৌঁছল। কে ফোন করে দিলে তারকারি হালদারের আপিসে। হালদার মশায়ের চেয়ে বয়সে বড় যাঁরা, তাঁরা ঠুকঠুক করে এগোলেন শেষ দেখাটা দেখবার জন্যে। কেউ বললেন ভাঙল এবার একটা পাহাড়ের চূড়া, কেউ বললেন মস্ত বড় একটা নক্ষত্র গেল খসে কালীঘাটের আকাশ থেকে। কয়েকজন ডালাধরা তা কেঁদেই ফেলল একেবারে। কংসারি হালদার চললেন, এ সংবাদে তাদের বুকের ভেতরটায় মোচড় দিতে লাগল। একদিন ওই বদরাগী গম্ভীব মানুষটার সামনে কোনও না কোনও ছুতায় পড়ে গিয়েছিল তারা, তাই তারা আশ্রয় পেয়েছে কালীবাড়িতে। প্রথমে খেতে হয়েছে ধমক, "মরবার আর ঠাঁই জুটল না কোথাও তোমার, তাই মরতে এসেছ পোড়া পেট নিয়ে কালী-বাড়িতে! আচ্ছা, থেকে যাও, চুরি-ছ্যাঁচড়ামি কোর না যেন। বামুনের ছেলে যখন তখন তুটো অন্ন জোটাবেই বেটী। কেউ এখেনে উপোস করে থাকে না।" তারপর তারা থেকে গেছে, ডালা হাতে চরে বেড়াচ্ছে কালীবাড়ির আশে পাশে। মা সত্যিই উপোসে রাখেন না কাউকে, কিন্তু সে ওই একটা পেটের দায়ই মা বইতে পারেন। একটা পেটের সঙ্গে আরও পাঁচটা পেট যে এসে জুটেছে কালীঘাটে, মা তাদের জন্যে দায়ী হন না। তাই ডালাধরার সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়, ডাইনে টানলে বাঁয়ে থাকে না কিছুই। তা না থাকুক, তবু ওই কংসারি হালদারের মুখের বাক্য না পেলে কি ওদের সাধ্য ছিল ডালা হাতে মায়ের বাড়িতে ঢোকার! টিপে পিষে থেঁতলে শেষ করে দিত তাদের আগে যারা এসেছে তারা। সেই আশ্রয়দাতা কংসারি হালদারের যাবার সময় এগিয়ে এসেছে, তাই তিনি বড় ছেলেকে কাছে ডেকে পাঠিয়েছেন—এই সংবাদ শুনে হতভাগা ডালাধরাদের চিরশুষ্ক

চোখও ভিজে উঠল। পায়ে পায়ে তারাও গিয়ে দাঁড়াল হালদার-বাড়ির দরজার সামনে।

ছুটল সবাই, অনেকে কিছু না জেনেই ছুটল। চলেছে যখন সকলে তখন নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটনার মত ঘটছে ওখানে, এই আশায় ছুটল অনেকে। ভিখিরীরা ছুটল কিছু দান হচ্ছে ভেবে, বামুনরা ছুটল কোনও রাজা-গজা এসেছে ভেবে। কেউ বা ছুটল শুধু মজা দেখবার আশায়। হয়তো ধরা পড়েছে একটা গাঁটকাটা, কিংবা কোনও মেয়েমানুষ নিয়ে কেলেঙ্কারি লেগে গেছে। কিংবা হয়তো কোনও অসাধারণ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, তিনি যাকে সামনে দেখেছেন তাকেই একেবারে রাজা করে ছেড়ে দিচ্ছেন। কিছুই অসম্ভব নয় কালীঘাটে, মুঠো মুঠো গিনি মোহর ছড়িয়ে উধাও হয়ে যায় এমন মহাপুরুষেরও আবির্ভাব ঘটে কালীঘাটে। কিন্তু মজা হচ্ছে, গিনি-মোহরগুলো কুড়িয়ে ঘরে আনলেই অমনি উবে যায় সেই সব মহাপুরুষদের মত। কাজেই কালীঘাটের আইন হল কোথাও একটা কিছু হচ্ছে শুনলেই ছোটা। কালীঘাটের আইন অনুযায়ী ছুটতে বাধ্য সকলে। সুতরাং ছুটল মানুষ হালদার-বাড়ির দিকে।

ত্রিপুরারি হালদার পা টিপে টিপে ঢুকলেন বাপের ঘরে। বাবা চোখ বুজে আছেন। দম বন্ধ করে অনেকক্ষণ তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন বাপের বুকের ওঠা-নামা। ইতিমধ্যে নিঃশব্দে ঘর বোঝাই হতে লাগল। বউ দুজন পায়েব কাছে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে লাগলেন। ছেলেমেয়েরা স্কুলে, তাদের আনবার জন্যে চাকর ছুটেছে তখন স্কুলের দিকে। খড়ম ছাড়া ভটচায এসে দাঁড়ালেন মাথার কাছে। বড় মিশ্র মশায় ধনুকের মত শরীর নিয়ে ঘরে ঢুকে এক কোণে বসে পড়লেন। বড়-বড়রা একে একে ঢুকতে লাগলেন ঘরে। সকলেই নির্বাক নিস্পন্দ নিস্তব্ধ, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন হালদার মশায়ের মুখের দিকে। একবার অন্তত চোখ খুলবেনই কংসারি হালদার, শেষ দেখা তিনি দেখবেনই তাঁর আত্মীয়-বন্ধুদের। এই আশায় সকলে গলা বাড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন হালদার মশায়ের মুখের দিকে।

বাইরের বারান্দায় জুতোর আওয়াজ উঠল। ঘরের মধ্যে নড়ে-চড়ে সরে দাঁড়াবার শব্দ হল। সকলে রাস্তা করে দিলেন। ডাক্তার নিয়ে ছোট ছেলে তারকারি দুই লাফে বাপের খাটের পাশে উপস্থিত হল। চমকে উঠে চোখ চাইলেন হালদার মশায়। চোখ চেয়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। এ কী, এত মানুষ কেন তাঁর ঘরে!

ততক্ষণে তাঁর ডান হাতখানা ধরে ফেলেছেন ডাক্তার, নাড়ী ধরে ঘড়ির দিকে চেয়ে আছেন তিনি। বাপের বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে তারকারি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করেছে। বড় মিশ্র মশায় ক্ষীণ-কণ্ঠে তারকব্রহ্মনাম জুড়ে দিয়েছেন। পঞ্চানন ভটচায বিড়বিড় করে বীজ গায়ত্রী জপছেন শিয়রে দাঁড়িয়ে।

সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে হালদার মশায় আবার চোখ বুজলেন। ত্রিপুরারি আর থাকতে পারলেন না, চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, "বাবা, বাবা গো—!" চোখ আর চাইলেন না হালদার মশায়, বাঁ হাতখানা তুলে ছেলের গায়ে রাখলেন। গুজগুজ ফুসফুস আরম্ভ হল ঘরের মধ্যে। ডাক্তার নাড়ী দেখা বন্ধ করে বললেন, "ঠিক আছে, এখন আর কোনও ভয় নেই। ওষুধটা আনিয়ে নিন। ওয়াচ রাখবেন, একটু অস্বস্তি বোধ করলেই দু ফোঁটা দেবেন জিভের ডগায়।"

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে, তাঁর জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই রৈ-রৈ আওয়াজ উঠল হালদার-বাড়ির সামনে। হাতে পায়ে গলায় কোমরে সর্বাঙ্গে নানা রঙের ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে বাঁধা রাজ্যের ইট পাটকেল খোলামকুচি ঝুলিয়ে বিকটদর্শন একটা পাগল ঢুকে পড়েছে ভিড়ের মাঝখানে। খুব সম্ভব আপাদমস্তক লোকটা ময়লা মেখে আছে। দুর্গন্ধে মানুষ অস্থির হয়ে তাকে তাড়াবার জন্যে রৈ-রৈ করে উঠেছে। সে কিন্তু ঢুকবেই বাড়ির মধ্যে, জোর করে ঢুকবে। পথ না ছেড়ে দিলে আঁচড়ে কামড়ে নিজের পথ করে নেবে সে। দু-একজনকে জাপটেও ধরেছে তার সেই বীভৎস চেহারার সঙ্গে। পাছে আবার কাউকে ছুঁয়ে ফেলে এই ভয়ে লোকজন ছুটতে আরম্ভ

করেছে। আবার কেউ কেউ দূর থেকে গলার জোরে তাড়াবার চেষ্টাও করছে লোকটাকে। কিন্তু ক্রমেই সে এগিয়ে যেতে লাগল হালদার-বাড়ির দরজার সামনে। বাড়ির ভেতর এখন ও ঢুকে পড়লে কী সর্বনাশ হবে এই ভেবে প্রাণপণে চেঁচিয়ে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল সকলে।

হঠাৎ সমস্ত গোলমাল ছাপিয়ে শোনা গেল—

"হরিনাম লিখে দিও অঙ্গে।"

হালদার-বাড়ির দরজার সামনে পৌঁছে ওপর দিকে মুখ তুলে পাগলটা আবার চেঁচিয়ে উঠল—

"হরি নাম লিখে দিও অঙ্গে।
তোমরা সকলে এই করিও মিলে
আমার প্রাণ যেন যায় হরিনামের সঙ্গে॥"

ওপরের ঘরে হালদার মশায আবার চোখ চাইলেন। অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন তিনি চতুর্দিকে। যেন ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছেন তিনি, যেন ওঠবার শক্তি থাকলে এখনই উঠে পালিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে ফেলতেন নিজেকে, যেন কেউ ধরতে আসছে তাঁকে। মরণের চেয়ে ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনার মধ্যে যেন এখনই তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

পঞ্চানন ভটচায চেঁচিয়ে উঠলেন, "কী হল। হল কী কাঁসারি? ও-রকম করছ কেন?"

হালদাব মশাই জবাব দিতে পাবলেন না। আবার তিনি চোখ বুজলেন, চোখ বুজে আড়ষ্ট হযে পড়ে রইলেন। ওপরে ওঠবার সিঁড়িতে তখন শোনা যেতে লাগল—

"আনিও তুলসীদল যত্ন করে তুলে
তারি মালা গেঁথে পরাইও গলে

হরেকৃষ্ণ নাম দিও কর্ণ-মূলে
জাহ্নবীর কোলে নিয়ে যেও সঙ্গে।
হরিনাম লিখে দিও অঙ্গে—"

একেবারে ওপরে উঠে এল যে!

কে চেঁচিয়ে উঠল, "বার করে দাও, দূর করে দাও ব্যাটাকে।"

সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন হৈ হৈ করে উঠল। ত্রিপুরারি তারকারি ঘুরে দাঁড়ালেন ঘর থেকে বেববার জন্যে।

হালদার মশায় চোখ চেয়ে হাত বাড়িয়ে বড় ছেলের হাতখানা ধরে ফেললেন। যেন ভিক্ষা চাইছেন তিনি, এই রকমের ভাব ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। কী যে বললেন ঠোঁট নেড়ে তা কেউ শুনতে পেল না। কিন্তু বুঝলে সকলে যে তিনি ওকে আসতে দিতে অনুরোধ করছেন।

ইতিমধ্যে একেবারে দরজার সামনে শোনা গেল—

"কফে কণ্ঠরোধ হইবে না সবিবে বুলি
আমায় বলিতে না দিবে বাধাকৃষ্ণের বুলি
আমার মাথায বেঁধে দিও হবিনামাবলী—"

ঘরের মধ্যে পা দিল। ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি করে সরে দাঁডাল সকলে, ছুঁয়ে না ফেলে লোকটা কাউকে। সে এগিয়ে আসতে লাগল বিছানার পাশে।

"আমার মাথায় বেঁধে দিও হরিনামাবলী
নিদানকালে যেন হেরি গো ত্রিভঙ্গে।
আমার নিদানকালে যেন হেরি গো ত্রিভঙ্গে—"

খাটের পাশে দাঁড়িয়েছে একেবারে। সামান্য একটু ঝুঁকে পড়েছে হালদার মশায়ের ওপর। ভয়ানক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন হালদার মশায়

ওর মুখের দিকে। ঘরের মধ্যে অন্য সবায়ের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। তখনও গান চলছে তার, "হরিনাম লিখে দিও অঙ্গে।"

তারপর থামল গান।

সঙ্গে সঙ্গে এমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল ঘরের ভেতরটা যে একগাছা চুল পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়। পাথরের মত দাঁড়িয়ে সকলে দেখতে লাগল। এতটুকু নড়চড় করারও শক্তি নেই কারও।

কী করবে এবার পাগলটা!

করবে কী ও!

পাগলটা কিছুই করলে না। প্রায় মিনিটখানেকের মত সময় নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইল হালদার মশায়ের চোখের ওপর। তারপর খটখট খটাখট শব্দ উঠল তার শরীরে ঝোলানো ইট-পাটকেলগুলো থেকে। ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে হাসতে লাগল লোকটা। হাসতেই লাগল সে অনেকক্ষণ ধরে হালদার মশায়ের দিকে তাকিয়ে।

তবু কেউ নড়ল না একটু। হাসির শেষে আর কী করবে ও, তাই দেখবার জন্যে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাকিয়ে রইল সকলে তার দিকে।

শেষে বন্ধ হল হাসি। তারপর গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠল পাগলটা—

"হালদার, সময় তো হয়েছে এখন। এবার ফিরিয়ে দাও আমায় সেটা। আর তো তোমার দরকার নেই হালদার সে জিনিসের।"

নিস্তব্ধ হল ঘর। পাগলটার দুই চোখে ফুটে উঠেছে ব্যাকুলতা। তার চোখ কান মুখ সর্ব অবয়ব জবাব শোনার জন্যে ক্ষুধার্ত উন্মুখ হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত ভাবে সে চেয়ে রয়েছে হালদার মশায়ের মুখের দিকে।

অনেকটা সময় কেটে গেল। তারপর আবার গমগম করে উঠল তার গলা—

"দেবে না হালদার? ফিরিয়ে দেবে না আমায় সে জিনিস? কী লাভ হবে তোমার জিনিসটা নষ্ট করে? তুমি চলে যাবার পরে ও জিনিসের দাম বুঝবে কে? কার কী উপকারে আসবে ওটা তখন?

ফিরিয়ে দাও হালদার, শেষ সময় আমার হাতে আমার জিনিস তুলে দিয়ে যাও।”

আবার নিস্তব্ধ। ঘরের প্রতিটি মানুষ তখন একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় চেয়ে রয়েছে ওদের দুজনের দিকে। আবার কী বলে পাগলটা, কী জবাব দেন হালদার মশায়, শোনার আশায় সকলের সর্বেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠেছে তখন। কিন্তু এ-পক্ষ ও-পক্ষ কোনও পক্ষেরই আর সাড়া নেই।

অনেকক্ষণ কাটল সেই ভাবে। তারপর নড়ে উঠল হালদার মশায়ের ঠোঁট। স্পষ্ট শোনা গেল তিনি যা বললেন। সর্বস্ব খোয়ালে যে সুর বেরয় মানুষের গলায়, সেই সুরে বললেন তিনি, “নেই, বিশ্বাস কর তুমি, নেই সে জিনিস আমার কাছে। আমি সেটা খুইয়েছি।”

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে রইল পাগল। তারপর আবার কেঁপে কেঁপে ফুলে ফুলে আরম্ভ হয়ে গেল তার হাসি। উদ্ভট হাসি হাসতে লাগল সে, খট-খটাখট আওয়াজ উঠল তার সর্বাঙ্গে ঝোলানো ইট-পাটকেল থেকে। তারপর সে ফিরে দাঁড়াল, এগিয়ে যেতে লাগল আস্তে আস্তে। পার হয়ে গেল ঘবেব দরজা। সিঁড়ির মুখে শোনা গেল—

“কাজ কী মা সামান্য ধনে!
আমার কাজ কী মা সামান্য ধনে!
ও কে কাঁদছে গো তোব ধন বিহনে।
কাজ কী মা সামান্য ধনে॥”

হালদার মশায় কাঠ হয়ে শুনতে লাগলেন—

“সামান্য ধন দেবে তারা
পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দাও মা আমায় অভয় চরণ
রাখি হৃদিপদ্মাসনে।
কাজ কী মা সামান্য ধনে!
আমার কাজ কী মা সামান্য ধনে॥”

পৌঁছে গেছে নীচে। এগিয়ে যাচ্ছে সদরের দিকে। রাস্তায় গিয়ে পড়ল এবার। রাস্তা থেকে শোনা গেল—

"গুরু আমায় কৃপা করে মা,
যে ধন দিলে কানে কানে।
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র ও মা
তাও হারালাম সাধন বিনে।
কাজ কী মা সামান্য ধনে॥"

হঠাৎ প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলেন হালদার মশায়, "ওরে ফেরা, ফেরা ওকে। ওকে বুঝিয়ে বলি, সত্যিই আমি হারিয়েছি সে জিনিস, সত্যিই সেটা আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে।"

কেউ নড়ল না, ঘরের ভেতব সব কটা মানুষ যেন পঙ্গু হয়ে গেছে।

আরও দূরে হালদারপাড়া লেনের মুখে শোনা গেল—

"প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা—
মা মা গো মা—"

ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল সেই কান্না, "মা মা গো মা—"

অনেক দূর থেকে ভেসে এল—

"প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা
হবে তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা বলে
স্থান পাই যেন ওই চরণে।
কাজ কী মা সামান্য ধনে॥"

আচম্বিতে ককিয়ে কেঁদে উঠলেন হালদার মশায়, "ভট্চায, কী হবে? কী উপায় হবে ভট্চায? ও যে ফিরে গেল কাঁদতে কাঁদতে, ফিরে গেল যে ও!"

পঞ্চানন ভট্টাচার্য একটিও কথা বললেন না। নীরবে হালদার

মশায়ের কপালে হাত বুলতে লাগলেন। ঠোঁট তার নড়তেই লাগল। কান পেতে শুনলে শোনা যেত তিনি জপ করে চলেছেন সমানে—

কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নোঘোরে প্রচোদয়াৎ।

ফনা-ফিনকির মা জপছেন।

জপছেন তাঁর ইষ্টমন্ত্র। জপের সঙ্গে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন তিনি—ফিরিয়ে দাও মা, আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও। না হয় মরা মেয়েই ফিরিয়ে দাও মা, তবু ফিরিয়ে দাও।

দিন গড়িয়ে গেল প্রায়, বাইরের কাজ সেরে গলির মানুষ ফিরে আসছে সকলে গলিতে। ফনা কাজ থেকে ফিরেছে অনেকক্ষণ, ফিরেই বেরিয়েছে বোনকে খুঁজতে। একবার দুবার তিনবার সে-ফিরে এল বাড়িতে, ফিরে একই দৃশ্য দেখল। দেখল, মা ঠায় একভাবে বসে আছেন দরজার দিকে তাকিয়ে। মায়ের ঠোঁট নড়ছে, আঁচলের মধ্যে হাতের আঙুলও নড়ছে, কিন্তু চোখের পাতা পড়ছে না। শেষবার, তা প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়েছে ফনা, সেও আর ফিরছে না।

ফনা-ফিনকির মা জপছেন, জপে চলেছেন তাঁর ইষ্টমন্ত্র। ইষ্টমন্ত্র ফিরিয়ে আনবে তাঁর মেয়েকে। নয়তো তিনি ইষ্টমন্ত্র পর্যন্ত ভুলে যাবেন যে। মেয়েকে যদি যমে নিত তা হলেও তিনি ইষ্টমন্ত্র ভুলতেন না। সর্বস্ব খুইয়েও তিনি ভোলেন নি তাঁর ইষ্টমন্ত্র। সব দুঃখ তিনি ভুলে-ছিলেন ইষ্টমন্ত্রের প্রভাবে। কিন্তু এতবড় সর্বনাশটা তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তাঁর পেটের মেয়ে বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে গিয়ে নাম লিখিয়ে রোজগারে নামবে, তারপরও তিনি জপবেন নাকি তাঁর ইষ্টমন্ত্র! তাঁর পেট থেকে যে রক্তমাংসের ডেলাটা পড়ল, যেটাকে তিনি বুকের রক্ত দিয়ে অত বড়টা করে তুললেন, যেটা তাঁর শরীরেরই অংশ, সেটা এখন বিক্রি হতে শুরু হবে! অসহ্য, এই ভাবনাটাই কিছুতে ভাবতে চান না তিনি, এতবড় সর্বনাশের ছায়াটা তাঁর মনের কোণে উদয় হলেই

তিনি সজ্ঞানে সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দেন মন থেকে। আর মানুষে ঠিক ওই জায়গাটাতেই দাগ দেয়।

এ বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা বার বার খোঁজ নিচ্ছে, "ফিরল না কি গো তোমার মেয়ে?"

জিজ্ঞাসা করার সুরটাই কেমন যেন হাড়-জ্বালানো গোছের। যেন ফিরবে না মেয়ে, এটা জেনেই ওরা প্রশ্নটা করছে বার বার। প্রশ্ন করে জবাব শোনার অপেক্ষা না করেই আরম্ভ করে দিচ্ছে ফিসফিস কথাবার্তা আর চাপা হাসিল। নাড়ু ঠাকুরের পিসী তো বলেই ফেললে, "ফিরবে গো ফিরবে। কেন অমন আওরে উঠছ বাছা? মেয়ে তোমার সেয়ানা, কাজ গুছিয়ে ফিরবে একেবারে।" পিসীর কথা শুনে চাপা হাসি আর চাপা রইল না। প্রত্যেকের ঘরেই সেয়ানা আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে। তা সেই মেয়ের সঙ্গেই গলা মিলিয়ে মা মাসী পিসী ঠাকুমা হিলহিল খিলখিল করে হেসে উঠল।

শেষে পাড়াতেও ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। ফিনকিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেই সকাল থেকে। শুনে পাড়ার মানুষ এ ওকে ও তাকে চোখ ঠেরে বললে, এটা সকলের জানাই ছিল। ও-মেয়ের চালচলন দেখেই সকলে জেনে ফেলেছিল যে ঘরে থাকার জন্যে ও-মেয়ে জন্মায় নি। আবার পাড়ার মধ্যে যাঁরা আরও বেশী ওয়াকিফহাল তাঁরা বললেন, "যাবেই মা ও-মেয়ে, যাবেই ও। ওই মায়ের পেটে ও-মেয়ে ঢোকবার আগেই ওর বাপ মরেছে তো, ও যে কোন্ গাছের ফল তা কি আর আমরা জানি না মা! ধম্মের কল বাতাসে নড়ে মা, ধম্মের কল বাতাসে নড়ে। দিনরাত মুখ টিপে ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকে যে ওই মাগী, সে কি শুধু শুধু নাকি! মুখ ও দেখাবে কী করে পাঁচজনকে!"

অতএব পাঁচজনে যাতে তাঁর মুখ দেখতে পায় এ জন্যে দরজার সামনে মুখ খুলে ঠায় একভাবে বসে আছেন ফিনকির মা। ধম্মের কল বাতাসে নড়ছে, নড়ছে তাঁর ঠোঁট দুখানি। ফিনকি তাঁর রক্তমাংস থেকে যদি জন্মে থাকে, যদি সত্যিই তিনি মেয়েকে পেটে ধরে থাকেন দশ মাস, তা হলে জ্যান্ত না হোক অন্তত মরা মেয়েটা ফিরিয়ে দাও মা।

সেও তিনি সহ্য করতে পারবেন, তা হলেও তিনি জপে যেতে পারবেন তাঁর ইষ্টমন্ত্র। কিন্তু তা যদি না হয় তা হলে তিনি ইষ্টমন্ত্রও যে ভুলে যাবেন।

ভোলবার মত অনেক কথা অনেক ছবিই ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে। কত কী যে ভুলতে হবে ইষ্টমন্ত্রের সঙ্গে, সব পর পর ছবির মত দেখতে লাগলেন তিনি। সে দিনটির কথা মনে পড়ে গেল। রক্তবর্ণ বেনারসী, তাঁর বিয়ের বেনারসীখানি পরে তিনি বসেছেন বাঁ দিকে, ডান দিকে বিয়ের জোড় পরে যিনি বসে ছিলেন তাঁকেও মনে পড়ে গেল। গুরুদেব বসেছেন সামনের আসনে। পূজা হোম হয়ে গেছে। যজ্ঞের গন্ধে আর ধোঁয়ায় ঘরের ভেতরটা থমথম করছে। গুরুদেব অভিষেকের কলস তুলে পঞ্চপল্লব ডুবিয়ে ঘটের জল ছিটতে লাগলেন দুজনের মাথায়। ফনা-ফিনকির মা অভিষেকের শেষ মন্ত্রটি আওড়ালেন মনে মনে—

“নশ্যন্তু চাপদঃ সর্বাঃ সম্পদ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেন শাক্তেন পূর্ণাঃসন্তু মনোরথাঃ ॥

হঠাৎ কী হল তাঁর। মুখের ওপর আঁচল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন তিনি। ইষ্টমন্ত্র ইষ্টদেবতা সব ভুলে গিয়ে অন্য একজনের কাছে একান্ত সংগোপনে জানাতে লাগলেন তাঁর আকুল আকূতি, “আর যে পারি নে আমি, আর যে সইতে পাবি নে আমি গো। একলা আর সইতে পারি না আমি এ ভার। মেয়েও আমায় ছেড়ে চলে গেল। এবার অন্তত একবার তুমি এস, যেখানে থাক একবার এসে খুঁজে এনে দাও তোমার মেয়েকে।”

হয়তো আরও অনেকক্ষণ চলত তাঁর গোপন আবেদন-নিবেদন। কিন্তু বাধা পড়ল। মনিবকে নিয়ে ফনা ঢুকল বাড়িতে। আড়তদার মশায় একেবারে তৈরী হয়ে এসেছেন। যা করার সব শেষ করে এসেছেন একেবারে। থানা পুলিস হাকিম কাউকে আর বাদ দেন নি তিনি। পয়সা আছে, লোকজন আছে, আর আছে সাদামাটা বোধজ্ঞান। তিনি

মনিব, তাঁর আড়তের কর্মচারী ফনা। সুতরাং তাঁরই লোক। তাঁর লোকের বোন চুরি গেছে, এ তিনি মুখ বুজে সহ্য করবেন কেন? মানে, তাঁর কি একটা মান-ইজ্জত নেই নাকি? কালীঘাট শালার পাজীর জায়গা। নোংরার জায়গায় কীই না হতে পারে! ও কি আর দেরি করতে আছে? লাগাও থানা পুলিস উকিল হাকিম। যায় যাক দু-চার শো খসে। তা বলে তাঁর লোকের অপমান তিনি মুখ বুজে সহ্য করবেন নাকি? শুধু তাই নয়, এখনই নিয়ে আয় ফনা তোর মাকে। চল্, আমিও যাচ্ছি সঙ্গে, ঠাকরুনকে পায়ে ধরে নিয়ে আসব ওই নরক থেকে তুলে। তারপর দেখাচ্ছি সব হারামজাদাদের। আমার লোকের গায়ে হাত দেওয়া, দেখাচ্ছি। ছুটে এসেছেন আড়তদার মশায়। ফনার মাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন ওপারে। ইজ্জত যেখানে থাকে না সেখানে মানুষ থাকে নাকি! বিচার নেই যেখানে সেখানে থাকবে কী করে মানুষে!

হাকিম চতুরানন চৌধুরীর মতও তাই। এপারের কালীঘাটের যেমন ইজ্জত নেই তেমন ওপারের বিচারালয়েরও বিন্দুমাত্র ইজ্জত নেই। বাস্তবিকই নেই একটু ইজ্জত ওই বিচারালয়ের। বিচারালয় না বলে বলা উচিত ওটাকে ভিখিরীদের একটা মস্ত বড় আড্ডা। হাত পেতেই আছে সকলে, উকিল মোক্তার মুহুরী পেশকার থেকে শুরু করে আদালতের ছুঁচো ইঁদুরটা পর্যন্ত পেতে আছে হাত। ঘুষ নিচ্ছে বলে কেউ মনেই করে না, ঘুষ দিচ্ছে বলেও কেউ মনে করে না। আদালতে এসেছি দুটো কাঁচা পয়সার মুখ দেখতে, আদালতে যখন ঢুকতেই হয়েছে তখন সর্বস্বান্ত হতেই এসেছি—এই হল দু পক্ষের মত। ওখানে টাকার খেলা, ওটা আদালত, এই রকম যেন ধারণা মানুষের। ছি ছি ছি ছি ছি—মহাবিরক্ত হয়ে একটা ঢোক গিললেন চতুরানন চৌধুরী। বেশ তেতো লাগল মুখ-গলার ভেতরটা হাকিম সাহেবের। তেতো মুখ নিয়েই বাড়ি ফেরেন রোজ তিনি। সারাটা দিন এক পাল

ঘুঘু-ঘড়েলের বাক্‌চাতুরী শুনে আর নাকের ডগায় ঘুষ নেওয়া-দেওয়া দেখে মন মেজাজ তেতো হয়ে যায় তাঁর। আইন আইন আর আইন! চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছেন তা যতবড় বে-আইনীই হোক, মুখ বুজে বরদাস্ত করতে হচ্ছে তাঁকে। কারণ আইনের ফাঁদে পা না দিলে আদালতের কিছুই করবার নেই। আবার পা দিলেও পা ফসকে যায় যদি টাকার জোর থাকে। টাকার ছিনিমিনি খেলার একটা আড্ডা হচ্ছে ওই আদালত। বড় বড় করে লিখে দেওয়া উচিত ওই আদালতের গায়েঃ টাকা দিয়ে এখানে যে কেউ যা খুশি কিনতে পার। টাকা খরচা করতে পারলে আইন তোমায় আইনসঙ্গত উপায়ে বে-আইনী করতে বাধা দেবে না।

পোলের ওধারে আদালত, এপারে কালীঘাট। হাকিম চতুবানন চৌধুরী এপারে থাকেন, ওপারে গিযে বিচাব কবে এপাবে ফিবে আসেন। যেমন ওপারের আদালতে বিচারের লড়াইয়ে জিতে এপারে আসে মানুষ কালাঘাটের মা-কালীকে পুজো চড়াতে। ওপাবেব পুজো চড়ানো শেষ হলে তবে এপারের পুজো চড়ানো। সবই পুজো চড়াবার ব্যাপার। হাকিম সাহেব একটু হাসলেন নিজের মনে। হাসলেন এই ভেবে যে, মা-কালী এপাবে বসে ওপারের হাকিমের কলম এমন ভাবে ঘুরিয়ে দিতে পারেন, যাতে হয় হয়ে যায় নয়, নয় হয়ে দাঁড়ায় হয়। এইটুকু ক্ষমতা আছে বলেই মা-কালী বেচাবা কবে খাচ্ছেন। আদালত ওপারে এত কাছে না থাকলে সত্যিই দিন চলা ভার হত মা-কালীর। মামলায় যে হারে আর যে জেতে, দু পক্ষই যেমন উকিল-পেশকারকে টাকা খাওয়াতে বাধ্য, তেমনি মা-কালীকেও উভয় পক্ষ ঘুষ দিচ্ছে। মামলা জেতবার জন্যে আগে থাকতে পুজো পড়তে থাকে মায়ের পায়ে। মামলা জিতলে তো পড়েই। হেরে গেলেও মানুষ পুজো দিয়ে যায় কালীঘাটে এসে। এই প্রার্থনা জানায় পুজো দিয়ে, এবারটা যা হবার তা তো হল, কিন্তু আসছে বারটা সামলে

দিও মা — আসছে বারটা মুখ রেখো জননী। এই বলে ঘরে গিয়ে সলা-পরামর্শ করে আবার একটা মিথ্যে মামলা লাগায়।

চতুরানন চৌধুরী সাহেবের গাড়ি পোলের ওপর উঠল। বাঁ দিকে জেলখানা, জেলখানাটার দিকে তিনি তাকালেন একবার। রোজই তাকান। কালীঘাট আর আদালতের মাঝখানে এই জেলখানা। আদালত থেকে কালীঘাটে সবাই পৌঁছতে পারে না। মাঝখানে এই জেলখানায় আটকা পড়ে। তিনিই আটকেছেন কত মানুষকে, পুজো চড়াতে আসতে দেন নি কালীঘাটে। অর্থাৎ মা-কালীর হাতযশ তিনিই অনেকবার খাটো করেছেন। কিছু আয়ও কমেছে মা-কালীর। এ জন্যে তিনি এবং তাঁর মত লোকেরাই দায়ী। সুতরাং মা কালী যদি মনে করেন, চতুরানন তাঁর ব্যবসার কণ্টক তা হলে কিছুই বলবার নেই। তবে একটু বুঝলে মা কালীও নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, হাকিম-জেলখানার ভয় না থাকলে মানুষ আর তাঁর কাছে গিয়ে আছড়ে পড়বে না। কস্মিনকালে যদি কখনও আদালতটা উঠে যায় ওখান থেকে, তা হলে মা-কালীর দিন চলাও মুশকিল হবে।

গাড়ি নকুলেশ্বরতলার পেছনে নতুন রাস্তায় একটা বাড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছল। চতুরানন চৌধুরীর পৈতৃক সম্পত্তি। রাস্তা বেরবার দরুন বাড়ির সামনেটা ভেঙে নতুন ছাঁদে গড়া হয়েছে। অনেক কালের বাড়িটা, একদা ওটা বানিয়েছিলেন যিনি তিনি ভয়ঙ্কর মানুষ ছিলেন। নাম ছিল তাঁর সহস্রানন চৌধুরী। চতুরাননের ওপর দিকে সাত-আট পুরুষ আগের পুরুষ তিনি। তাঁর সম্বন্ধে অদ্ভুত সব গল্প বলে এখনও কালীঘাটের পুরনো লোকে। তিনি নাকি আস্ত একটা পাঁঠা প্রত্যহ জলযোগ করতেন। একবার তিনি এক শো আটটা নরবলি দিয়েছিলেন মা-কালীর বাড়িতে। দক্ষিণের একটা তালুকের বজ্জাত প্রজাদের শায়েস্তা করবার জন্যে এই কর্ম করতে হয়েছিল তাঁকে। ছিপ পাঠিয়ে-ছিলেন একশোখানা প্রজাদের ধরে আনবার জন্যে। ধরে আনিয়ে স্রেফ বলিদান। একটার পর একটা, একেবারে এক শো আটটায় পৌঁছে তারপর থেমেছিলেন।

এ কথাও নাকি লেখা আছে কোন দলিলে যে, সাবর্ণ-গোত্রীয় এই চৌধুরী-বংশই মা-কালীর সেবাপূজার ব্যবস্থা করেন সেই মহারাজ মানসিংহের আমলে। হাকিম চতুরানন চৌধুরী তাই কালীঘাটের সঙ্গে সম্বন্ধ তুলে দিতে নারাজ। অবশ্য নরবলি দেবার লোভে নয়, নরবলি এমনিই কত হচ্ছে এখন মায়ের বাড়ির চতুর্দিকে। ধড় থেকে মুণ্ড খসাবার জন্যে সহস্রানন মাত্র একটি করে চোপ দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই, এখন ওই চোপের কায়দাটা একটু পালটেছে। এখন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটা হয়। সাবর্ণচৌধুরী-বংশের বংশধর চতুরানন কালীঘাটে বাস করছেন ওই পেঁচিয়ে-কাটাদের গায়ে একটু হাত বুলবার জন্যে। তাঁর স্ত্রী গায়ত্রী দেবী নিয়েছেন অন্য এক ব্রত। তিনি কালীঘাটে নারীবলিটা উঠিয়ে দিতে চান। আর বলিদান হয়ে গেছে যে সব নারীর, সেগুলোকে আবার জুড়েতেড়ে কালীঘাটের কালীদ' থেকে উদ্ধার করতে চান।

হাকিম নামলেন গাড়ি থেকে। নেমেই তাঁর মনে হল সেই মেয়েটার কথা। মাথাফাটা মেয়েটাকে সকালে দিয়ে গেল শশেঘোড়া। কে জানে ওটা আবার আমদানি হল কোথা থেকে! যাক, তবু ভাল যে জাহান্নমে নামবার আগের মুহূর্তে ও পড়ে গেল শশেঘোড়ার নজরে। নয়তো এতক্ষণে ওর কপালে কী যে ঘটত, তা ভেবে হাকিম সাহেবের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। অদ্ভুত মানুষ ওই শশী, দিন রাত নিজে ডুবে আছে নরকে। কিন্তু অন্য কাউকে সেই নরকে নামতে দেখলেই তাড়া করবে। সেদিন ধরে এনেছিল কয়েকটা স্কুলের ছোঁড়াকে। গলা টিপলে দুধ বেরয় এতটুকু সব বাচ্চা, গিয়ে জুটেছে সত্যপীরতলার মেলায়। মেরে একেবারে হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে ধরে এনেছিল সব কটাকে শশী। হাকিম চতুরানন তখন অভিভাবকদের ডাকিয়ে তাদের হাতে ছেলেদের সঁপে দেন।

কিন্তু গায়ে হাত তোলাটা যদি বন্ধ করতে পারত শশী! ওই একটা রোগেই একদিন ওকে খাবে। শুধু ওকেই খাবে না, হাকিম চতুরাননকেও ডোবাবে। সেই ছেলেদের অভিভাবকরা এসে দস্তুরমত শাসিয়েই গেলেন হাকিমকে বে-আইনী কাজ সমর্থন করার দরুন। গায়ে হাত তোলাটা

বে-আইনী কাজ যে, কিন্তু বেশ্যা যখন পয়সা দিলে মেলে বাজারে তখন বেশ্যাবাড়ি যাওয়াটা বে-আইনী নয়। ভাগ্যে ছেলেগুলোর বয়স চোদ্দ বছরের কম ছিল, তাই অভিভাবকদের চোখ রাঙিয়ে সেদিন তাড়াতে পেরেছিলেন চতুরানন। সব কটা ছেলেকে রিফর্মেটরিতে ঢুকিয়ে চিরকালের জন্যে মাথা খেয়ে দেবেন দাগী করে, এই কথা বলতে তবে তাঁরা আইনের ভয় দেখানো বন্ধ করেন।

এ মেয়েটার বয়েসও বোধ হয় চোদ্দ বছরের কমই হবে। এই রকমের ছোট মেয়ে কত যে রয়েছে তীর্থস্থানের নরকে, কে তার হিসেব রাখে! আইন বাঁচিয়ে বেচা-কেনা চলে ওই সব ছোট ছোট মেয়ের। কাজেই ওপারের আদালতের নাগাল এপারে পৌঁছয় না।

চতুরানন বাড়ির ভেতর ঢুকলেন। শোনা যাক, গায়ত্রী কী সংবাদ বার করেছে মেয়েটার পেট থেকে!

গায়ত্রী দেবীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়েই এমন সংবাদ শুনলেন হাকিম সাহেব যে তৎক্ষণাৎ তাঁকে ছুটতে হল যে ঘরে ফিনকি শুয়ে আছে সেখানে। বেহুঁশ ফিনকি জানতেও পারল না, একজন হাকিম তার পাশে বসে তার হাতখানা ধরে তার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। গায়ত্রী দেবী শোনালেন, ডাক্তার ডাকা হয়েছিল, ইনজেকশন দিয়ে গেছেন। রক্তও নিয়ে গেছেন। বলে গেছেন টিটেনাস বোধ হয়, সাবধান না হলে টিকনো মুশকিল।

আবার আঁধার।

একটু একটু করে আবার ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার হালদার মশায়ের দুই চক্ষে। আবার তিনি চলে যাচ্ছেন মরণের জঠর-গহ্বরে। কালিতে ছেয়ে যাচ্ছে তাঁর দৃষ্টি, কালিতে ডুবে যাচ্ছে তাঁর অন্তর। সত্যিকারের মরণ কি এর চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর!

এ মরণ রোজই তিনি মরেন একবার করে। কিন্তু এতদিন এ মরণে দুঃখ ছিল, ভয় ছিল না। আজ যেন ভয় করছে তাঁর। যদি তিনি আর ফিরে না আসেন এই কালো অন্ধকারের গ্রাস থেকে! যদি কাল ভোরে আবার না দেখতে পান জানলার কাচগুলো! যদি কাল তপু-তারুকেও চিনতে না পারেন হালদার মশায়!

আজ জীবনে সর্বপ্রথম তিনি জানতে পেরেছেন মানুষ তাঁকে কী ভালটাই না বাসে। আজ তিনি তাঁর ছেলেদের বউদের ভট্‌চাযকে বুড়ো মিশ্রকে সকলকে নতুন চোখে দেখলেন। জীবনের ওপর আবার নতুন করে মায়া জন্মেছে তাঁব। তাই হালদার মশায় ভয় পাচ্ছেন আবার মরণের মাঝে তলিয়ে যেতে।

তা ছাড়া—

হাঁ, তা ছাড়া একটা বোঝাপড়া এখনও বাকি থেকে গেল। সেটা চুকিয়ে ফেলবার জন্যেও তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে আরও কিছুদিন। চোখের আলো কিছুতেই নিভে গেলে চলবে না এখন। চোখ না থাকলে যে কিছুই করতে পারবেন না তিনি। শুয়ে শুয়েও তিনি অনেক কিছু করতে পারবেন, সেটাকে উদ্ধার করে এনে যার জিনিস তার হাতে দিয়ে যেতে পারেন, যদি চোখের আলোটুকু বজায় থাকে। নয়তো ওই পাগল ওইভাবে কেঁদে কেঁদে ঘুরতে থাকবে আর যারা সেটা হাতে পেল তারা সেটা নিয়ে মজা করবে। ভাববে কাঁসারি হালদারকে ঠকিয়ে কী বস্তুই না হাতে পেয়েছি! বেটা হালদার চেয়েছিল, ওই জিনিসের বদলে

চিরকাল ওর পালা চালিয়ে মরতে হবে। গোল্লায় যাক হালদার আর হালদারের পালা। আর তো বেটা উঠে এসে দাঁড়াতে পারবে না আমাদের দরজায়।

মাড়ি দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন হালদার মশায়। সবাই এল, আদিগঙ্গার এপার ওপার দুপারের চেনা জানা কেউ বাদ রইল না আসতে। কাঁসারি হালদার মরছে শুনে রাস্তার ভিখিরী থেকে লাখপতি কোটিপতি পর্যন্ত সবাই ছুটে এল, এল না শুধু তারা। তার মানে, কংসারি হালদার একেবারে উবে গেছে তাদের জীবন থেকে। কারণ যা তাদের পাবার ছিল কংসারি হালদারের কাছে, সেটা তাদের হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়েছে।

পড়াচ্ছি, ওই মুঠো আলগা করার মন্ত্র জানি আমি। যদি কাল ভোরে আবার চোখের আলো ফুটে ওঠে কংসারি হালদারের, তা হলে ভেবো না তোমরা যে কাঁসারির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। তোমাদের সর্বনাশ করে তবে আমি মরব। সে মরণের সময় একটি প্রাণীও আসবে না আমার ঘরে, হয়তো ওই ছেলে-বউরাও মুখে একটু জল দেবে না, তাদের মুখ চিরকালের জন্যে হেঁট করিয়ে দিয়ে গেলাম বলে। হয়তো ভট্‌চায প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্রগুলোও পড়াবে না। সমস্ত কালীঘাট কংসারি হালদারের নাম করে তখন থুতু ফেলবে। কংসারি হালদারের ঊর্ধ্বতন চোদ্দ পুরুষের নাম চিরকালের জন্যে কালিতে কালো হয়ে যাবে। যাক, তবু এতবড় বেইমানির শাস্তি না দিয়ে কংসারি হালদার মরবেন না। জিনিসটা হাতে পেয়ে একটিবার দেখতেও এল না! মরণ-শয্যায় শুয়ে আছেন তিনি, তবু তাঁর পালার ব্যবস্থা করলে না তারা! ভাবলে, হালদারের বিষদাঁত আর নেই। আচ্ছা, সকালটা হোক, তারপর তাদের দেখাচ্ছি। যত বড় সর্বনাশই হোক কংসারি হালদারের, তবু হালদার তাদের দংশন না করে মরবে না।

আঃ—

একশোটা বিছেয় যেন একসঙ্গে হুল ফুটিয়ে দিলে হালদার মশায়ের শিরদাঁড়ার ওপর। আড়ষ্ট হয়ে গেলেন তিনি।

একদিন আগেও যদি তিনি জানতে পারতেন যে তাঁর ছেলেরা তাঁর পালা চালাবে! যদি তিনি একটিবারের জন্যেও বিশ্বাস করতে পারতেন এই বংশের ছেলেদের! যদি তাঁর বউমায়েরা একবারও জীবনে এত কাছে এসে দাঁড়াত তাঁর!

এই তো, এক বউ বসে আছে তাঁর পায়ের কাছে। নিঃশব্দে বসে তাঁব পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ওরা এবার তাঁর কাছে বসে রাত জাগবে। এক মুহূর্ত আর ওদের সজাগ সতর্ক দৃষ্টির আড়ালে নড়তে পারবেন না তিনি। আঃ, এই সেবা যত্ন আত্মীয়তার ছিটে-ফোঁটার আস্বাদও যদি তিনি পেতেন এর আগে!

তা হলে এত বড় সর্বনাশটা কিছুতেই হত না। কিছুতেই হাতছাড়া করতেন না তিনি সেই যন্ত্র। এ বংশেব মান ইজ্জত কখনও ধুলোয লোটাত না। ওই যন্ত্র ঘরে থাকলে লক্ষ্মী সরস্বতী ঘরে বাঁধা থাকেন। তিন পুরুষ পর্যন্ত লক্ষ্মী বাঁধা থাকেন ঘবে, সরস্বতী বাস কবেন মুখে। মনে মনে একবাব আওডালেন হালদাব মশায—

স্পর্ধামুদ্ধৃয় কমলা বাগ্দেবী মন্দিরে মুখে।
পৌত্রান্তং স্থৈর্যমাস্থায় নিবসত্যেব নিশ্চিতম্‌॥

সেই লক্ষ্মী-সরস্বতীকে তিনি স্বহস্তে বিদেয কবেছেন ঘব থেকে। মা নিজের পালা নিজেই চালিযে নেন, এ কথাটা জীবনে বহুবাব তিনিও উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু সেই পালা চালাবাব গবজে মাকেই তিনি ঘর-ছাড়া করে ছেড়েছেন। আর তাঁব ছেলেরা এই বংশের ছেলের মত সারা দিন উপোস করে আজ পালা চালাচ্ছে।

মনে মনে আব একবাব প্রতিজ্ঞা করলেন হালদাব মশায়, কাল যদি আবার আলোব মুখ দেখতে পান তিনি, তা হলে যে মূল্যই দিতে হোক না কেন, একবাব দেখে নেবেন তাদের। হয় তারা ফেরত দেবে সেই যন্ত্র, নয়তো জাহান্নমে যাবে। হালদার মশায়ের বংশও সেই সঙ্গে নামবে জাহান্নমে। তা নামুক, তবু তাদের ছাড়বেন না কংসারি হালদার। এতবড় বেইমানি কিছুতেই তিনি বরদাস্ত করবেন না।

অন্ধকার নেমে এল ফিনকিদের গলিতেও।

সেই অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে গলিতে ঢুকে পড়ল ধনা। সারা দিনে অনেকবার সে হাঁটাহাঁটি করেছে গলির মুখে, যদি একবার দেখাটা হয়ে যায় এই আশায়। একবার সে বেরবেই, তেল নুন লঙ্কা হলুদ একটা কিছুর দরকার হলেই বেরতে হবে তাকে গলি থেকে। তখন ধনা তাকে আবার একবার ঘাটে যাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে সুট করে মিশে যাবে রাস্তার ভিড়ে। বাস্, সোজা কাজ।

কিন্তু গলির ভেতর ঢোকা সোজা কাজ নয়। ধর, যদি কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে বসে কোনও কথা! কেন সে ঢুকল গলিতে, কাকে সে চায়, কী দরকার আছে তার ও-পাড়ায়, এই জাতের কোনও প্রশ্ন যদি করে বসে কেউ! কিংবা হয়তো ধর, দেখা হয়ে গেল খোদ সেই ফিনকির সঙ্গেই। গলিতে ভিড় নেই, কারও না কারও নজরে পড়বেই ধনাতে ফিনকিতে কথা বলছে। তা হলেই সেরেছে কর্ম, যা ছ্যাঁচড়া মানুষ সব, তৎক্ষণাৎ যার যা মুখে আসবে রটাতে শুরু করবে।

তা ছাড়া যা ভয়ানক মেজাজ মেয়ের, গলির ভেতর কিছু বলতে গেলে যদি অমনি চেঁচামেচি করে লোক জমা করে ফেলে! কোনও কিছুই অসম্ভব নয় ও মেয়ের পক্ষে। এই সব সাত-পাঁচ বিবেচনা করেই ধনা দিনের বেলা গলিতে ঢুকতে সাহস করে নি।

কিন্তু সন্ধ্যার পর আর সে থাকতে পারলে না, ঢুকে পড়ল গলির ভেতর। সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই সে বেরবে না বাড়ি থেকে, দেখা হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই তার সঙ্গে। তবু তাদের দরজার সামনে দিয়েও ঘুরে আসা হবে একবার। ভাল করে দেখে আসা হবে তাদের বাড়িটা। আর সম্ভব হলে, অবশ্য কী করে যে সম্ভব হবে তা ধনার মাথায় এল না কিছুতে, মোটের ওপর সম্ভব যদি হয় তো তাকে একটু জানিয়ে আসা যে ধনা ছায়ার মত আছে তার সঙ্গে। দেখাটা একবার হওয়াই চাই যে,

আজ হোক কাল হোক যেদিনই হোক। দেখা হলে ফিনকিকে বেশ করে সাবধান করে দেওয়া চাই ওই পাথরখানা সম্বন্ধে। জিনিসটাকে যেন হেলাফেলা না করে ফিনকি, কোনও রকমে যেন যত্ন করে লুকিয়ে রাখে আর কয়েকটা দিন। কংসারি হালদার চোখ ওল্টাল বলে, আজই যাচ্ছিল বুড়ো খতম হয়ে। তারপর ওই পাথরখানা দিয়েই তাদের কপাল ফিরে যেতে পারে। তাদের মানে তার আর ফিনকির দুজনেরই। দুজনের কপাল একসঙ্গে ফিরে যাবে ওই পাথরখানার পয়ে। মানে, ওই পাথরখানার পয়েই হয়তো জোড়াও লেগে যেতে পারে দুজনের দুখানা কপাল, জুড়ে এক হয়ে যেতে পারে। ধনা তো একরকম সব ঠিকই করে ফেলেছে। চুরি ছ্যাঁচড়ামি আর কস্মিনকালে হবে না তার দ্বারা। ওসব হুজ্জতের কাজে আব সে নেই। খামকা মারধোর খেয়ে মরা যার-তার হাতে। তাতে না ভরে পেট না বাঁচে ইজ্জত। আর বিয়ে হয়ে গেলে তখন দু-দুটো পেট দু-দুজনের ইজ্জত। কাজেই ও সব কাজে হাত দিয়ে আর হাত ময়লা কববে না ধনা। বরং সে সাইকেলের দোকানে একটা কাজ জুটিয়ে নেবে। তাতে হাতে কালি লাগলেও মনে কালি লাগবে না।

এ কথাটাও ফিনকিকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে যে সাইকেলের কাজে দিনে তিন-সাড়েতিন টাকা পর্যন্ত অনায়াসে কামানো যায়। ধনাই পারে সাড়ে তিন টাকা পর্যন্ত কামাতে যদি বড় একখানা সাইকেলের দোকামে কাজ জোটাতে পারে। সেই ধান্দাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ধনা। ওধারে ধনার ঠাকুমা-বুড়ীও হন্যে হয়ে উঠেছে নাতির বিয়ে দেবে বলে। কিন্তু ধনা ঠাকুমাকে সাফ বলে দিয়েছে যে বিয়ের আগে একটা কাজ পাওযা চাই। ডালাধরা হয়ে চিরকাল সে মায়ের বাড়িতে পচে মরতে পারবে না। আর মায়ের বাড়িতে ধনা টিকতেও পারবে না কিছুতে। কোথাও একটা কিছু ঘটলেই লোকে খুঁজে বার করবে ধনাকে। বাস্, তারপর চড় থাপ্পড় আরম্ভ হয়ে গেল বে-খরচায়। সেইটুকুই ভাল করে বুঝিয়ে বলতে চায় ধনা ফিনকিকে যে বদনাম যখন একটা উঠে গেছে তার নামে কালীঘাটে তখন কালীঘাটে থাকা তাদের

কিছুতে পোষাবে না। সাইকেল সারাবার দোকান ছুনিয়াময় আছে, পেটের ভাতও আছে সবখানে। এখন কোনও রকমে বিয়েটা হয়ে গেলে হয়। তারপর ধনা আর ফিনকির জায়গার অভাব হবে না কলকাতা শহরে।

কিন্তু—

ধনার পা ফেলা অনেকটা আড়ষ্ট হয়ে এল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে কপাল কুঁচকে সে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু সে মেয়েই যদি বলে বসে—না! যা মেয়ে ও, ওই হয়তো বেঁকে বসবে ধনাকে বিয়ে করতে। হয়তো বলে বসবে, ওই চোরটার সঙ্গে বিয়ে দিলে বিষ খাব গলায় দড়ি দেব। কিছুই অসম্ভব নয় ও-মেয়ের পক্ষে।

সেইজন্যেই বিশেষ করে একটিবার দেখা করতে চায় ধনা তার সঙ্গে। মুখের কথায় যদি বিশ্বাস না করে তা হলে ধনা ওর গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করবে। বলবে, এই তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি যে চুরি ছ্যাঁচড়ামি আমি ছেড়ে দিয়েছি। সেদিন মা-কালীর মন্দিরে লোকে আমায় মেরেই ফেলত। তুমিই আমায় বাঁচিয়ে দিলে, নয়তো অত দামী হারছড়া ফেরত না দিলে করত কে কী তোমার! সেদিন থেকেই ও সব ছোট কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি জন্মেব শোধ। ও সব কথা মনে উঠলেই সেদিনের তোমার সেই চোখ মুখ আমার মনে পড়ে যায়। হারছড়া ঝুলিয়ে ধরে হাতখানা মাথার ওপর তুলে নীচে থেকে তুমি চেঁচিয়ে উঠেছিলে, "হালদার মশায়, পেয়েছি আমি, পেয়েছি সেই হার।" হাজার মানুষ সেদিন তাকিয়েছিল তোমার মুখের দিকে। সে মুখ আমিও দেখেছিলাম। সেইজন্যে ও সব কাজ মনে উঠলেই তোমার সেই মুখ আমি দেখতে পাই। আর অমনি মনে হয়, আবার ওই ছোট কাজে হাত দিলে তোমার মুখ ভার হয়ে উঠবে। তাই আমার আর কিছুই করার উপায় নেই। বিশ্বাস করাতে হবে তাকে যে হাজার ইচ্ছে থাকলেও ধনা আর জীবনে কখনও ছোট কাজ করতে পারবে না।

কিন্তু দেখা পেলে তো বিশ্বাস করাবে তাকে! বেরলই না যে সারাদিন সে গলি থেকে! অগত্যা ধনাকেই ঢুকতে হল গলির মধ্যে। যদিও সে ভাল করে জানে, এখন সন্ধ্যার পরে কিছুতেই দেখা হতে

পারে না তার সঙ্গে। তবু ধনা চলল এগিয়ে, শুধু শুধু একবার ফিনকিদের দরজার সামনে দিয়ে ঘুরে আসতে পারবে তো। আর ধর যদি তেমন বরাত হয় ধনার, তা হলে টপ করে একবার সাবধান করে দেবে পাথরখানা সম্বন্ধে। যেন কিছুতেই না খোয়া যায় ওখানা। ভয়ানক দামী জিনিস ওটা, ফিনকি তো আর জানে না ওটার দাম। হালদার মশায় বার বার না বলে দিলে ধনাই বা বুঝত কী করে ওটার মূল্য কত! বুঝতে পেরেই তো ধনা ওখানা সঁপে দিলে ফিনকির হাতে। যে ভাবে হালদার মশায় পাথরখানা ঠাকুরঘর থেকে আনালেন ধনাকে দিয়ে, যে ভাবে তিনি ধনাকে ওখানা পৌঁছে দিয়ে আসতে বললেন খালের ওপারে একজনের নাম ঠিকানা দিয়ে, যে ভাবে বার বার হালদার মশায় সাবধান করে দিলেন ধনাকে যেন কিছুতেই না হারায় সেটা, তাতেই ধনা বুঝে নিয়েছিল যে ওই পাথরখানা যা তা জিনিস নয়। পাথরখানাকে ধনার হাত থেকে নিয়ে বার বার কপালে ঠেকালেন যখন হালদার মশায়, আবার ধনার হাতে দিতে গিয়ে ওঁর মত লোকের চোখে যখন জল এসে গেল, তখনই ধনা বুঝে নিয়েছিল যে একটা কিছু ব্যাপার আছে ওই পাথরের মধ্যে।

কালীঘাটের হালদারদের বাড়িতে অমন কত কী সব মহামূল্য বস্তু আছে। তাই জন্যেই না হালদাররা লোকের মাথায় পা দিয়ে হাঁটে। আর তাই জন্যেই ধনা তৎক্ষণাৎ মতলবটা ঠিক করে ফেললে, ও জিনিস কখনও হাতছাড়া করতে আছে হাতে পেয়ে! কিন্তু রাখবে কোথায় সে লুকিয়ে ওই পাথর? ঠাকুমা-বুড়ীর হাতে দেওয়া যায় না বিশ্বাস করে, কারও হাতেই দেওয়া যায় না। বিশ্বাস ধনা কাউকেই করে না এই তুনিয়ায়। অগত্যা শেষ পর্যন্ত একমাত্র যাকে সে বিশ্বাস করে, তাকে গঙ্গার ঘাটে ডেকে নিয়ে তাব হাতে গুঁজে দিয়ে সরে পড়ল। মানে, কী যে হল সে দিন ধনার, একটা কথাও বলতে পারলে না তার সঙ্গে। যা ধমকাধমকি আরম্ভ করল মেয়ে চোখ পাকিয়ে। নয়তো সেই সময়েই ধনা সাবধান করে দিত তাকে পাথরখানা সম্বন্ধে। কিন্তু কী যে হল তার তখন, না পারলে চোখ তুলে তার মুখের দিকে চাইতে,

না পারলে পাথরখানা সম্বন্ধে দুটো কথা বুঝিয়ে বলতে। এমন কি, সবচেয়ে দরকারী কথাটাও বলা হল না।

সেটাও কিন্তু জানাতে হবে মেয়েটাকে। এ খবরটি দিতেই হবে যে ধনা তার ঠাকুমাকে বলেছে, বিয়ে যদি করতেই হয় তা হলে করবে সে ওই ফিনকিকেই। ঠাকুমা-বুড়ী প্রথমে বেঁকে বসেছিল, কারণ ফিনকির মা ভাই এক পয়সা খরচা করতে পারবে না। না পারে না পারুক, তবু ওই মেয়ে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না ধনা। এইটুকু বেশ বুঝতে পেরে শেষে ঠাকুমা রাজী হয়েছে। ফিনকির মা-ভাইও নিশ্চয়ই রাজী হবে। কারণ বিয়ে দিতে গেলে পয়সার দরকার। মেয়েকে খেতেই দিতে পারে না তো বিয়ে দেবে কোথা থেকে! কাজেই রাজী হয়ে বসে আছে ওরা যখন জাত গোত্র সব ঠিকঠাক মিলে গেছে। এখন ওই মেয়েই না বেঁকে বসলে হয়! সেই ভয়েই আগে থাকতে আর একটিবার তার সঙ্গে দেখা করাটা একান্ত দরকার ধনার।

তাই এ গলি ও গলি দিয়ে এগিয়ে চলল ধনা সন্ধ্যার পর। শেষ পর্যন্ত পৌঁছল। শেষ মোড়টা ফিরতেই দেখা গেল ফিনকিদের দরজা।

কিন্তু ও কী! বাড়ির দরজায় ভিড় কেন! জিনিসপত্রই বা সব বার করা হয়েছে কেন বাড়ি থেকে সন্ধ্যার পর?

ধনা ভুলে গেল, এ সময় তাকে ওখানে দেখলে লোকে পাঁচ রকম প্রশ্ন করে বসতে পারে। সোজা সে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ফিনকিদের দরজার সামনে। প্রথমেই যে কথা তার কানে গেল, তাতে তার দুই চোখ কপালে উঠে গেল একেবারে। শুনলে, ফিনকির মা কাঁদছেন। কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, "আজ রাত্তিরটা অন্তত আমায় নিয়ে যাস নি ফনা এখান থেকে। ফিরবেই ফিনকি, ওরে, আমি বলছি সে ফিরবে। ফিরে আমাদের দেখতে না পেলে সে করবে কী? যাবে কোথায়?"

যাবে কোথায়! গেল কোথায় সে?

কোথায় যেতে পারে ফিনকি! কেন সে পালাতে গেল?

ও মেয়েকে কেউ ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাবে এ কি কখনও সম্ভব হতে পারে !

ধনা নিজের মনেই নাড়লে একবার নিজের মাথাটা। না, কিছুতেই ফিনকিকে কেউ চুরি করে নিয়ে যায় নি। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে ফিনকির চোখের ওপর চোখ রেখে যা-তা কিছু একটা বলবে ! আর জোর করে তাকে আটকে রাখা, ওরে বাপ রে ! তা হলে এতক্ষণে হয়তো আঁচড়ে কামড়েই তাদের দু-একজনকে খতম করেছে ফিনকি। নয়তো নিজেই গেছে শেষ হয়ে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে। সবই সম্ভব ওই মেয়ের পক্ষে, শুধু সম্ভব নয় একটি জিনিস। ধনা বার বার মনে মনে ঘাড় নাড়ল। না, কিছুতেই তা সম্ভব নয়, কোনও লোভেই ফিনকি খারাপ কাজ করতে পারে না—না।

অতএব এখন প্রধান কাজ হল তাকে খুঁজে বার করা। চুলোয় যাক সে পাথর-মাথর, কচু পোড়ার পয় আছে সে পাথরে। ওই পাথর-খানার জন্যেই হয়তো কোনও বিপদে পড়েছে ফিনকি ! ওই পাথর-খানার লোভেই কেউ আটকায় নি তো তাকে ! কাউকে হয়তো দেখিয়ে থাকবে পাথরখানা, যে জানে ওটা কী ! বাস্, তারপর সেই অলক্ষুণে পাথর নিয়ে লেগে গেছে খেয়োখেয়ি। যা সাংঘাতিক মেয়ে ফিনকি, কিছুতেই দিতে চায় নি সেই পাথর। শেষ পর্যন্ত পাথরের জন্যেই বেচারাকে পড়তে হয়েছে কারও ফাঁদে। পাথর হাতছাড়া না করলে আর ফাঁদ কেটে বেরবার উপায় নেই তার।

কিন্তু পাথরখানা এখন আছেই বা কোথায় ?

পাথরখানা কি এখনও সঙ্গে আছে ফিনকির ?

ওঁরা তো চলে গেলেন আড়তদারটার সঙ্গে ওপারে। ওই ঘরেই কোথাও লুকিয়ে রাখে নি তো ফিনকি পাথরখানা !

কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবে ধনা, কে-ই বা উত্তর দেবে তাকে ! সর্বপ্রথম ধনার জানা দরকার কখন গেল ফিনকি, কী অবস্থায় গেল সে ! বাড়ি থেকেই সোজা চলে গেল, না, অন্য কোনও কাজে বেরিয়ে গিয়ে আর ফেরে নি ! অনেক কথাই জানা দরকার এখন ধনার, কিন্তু

জিজ্ঞাসা করবে সে কাকে ? ও-বাড়ির বা ও-পাড়ার কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে উল্টে বিপদ ঘটবে। আড়তদার মশায় যে পুলিসটাকে ফিনকিদের বারান্দায় বসিয়ে রেখে গেল, সেই পুলিসটাকে তখন জানিয়ে দেবে লোকে যে এই ছোঁড়া মেয়েটার খোঁজ করছে। বাস্, তার মানে তাকেই ধরে টানাটানি জুড়ে দেবে তখন। থানায় নিয়ে গিয়ে মারধোর করে আটকে রাখবে সারা রাত। তা হলেই সব কাজের দফা-রফা একেবারে। এখন কিছুতেই কোথাও আটকে থাকলে চলবে না ধনার। খুঁজে বার করতেই হবে তাকে, এই রাতেই খুঁজে বার করতে হবে। কে বলতে পারে এখন কী অবস্থায় আছে সে! যে অবস্থাতেই পড়ুক, যেখানেই থাকুক, খুঁজে তাকে বার করবেই ধনা। ধনার ইচ্ছে করতে লাগল নিজের গালে থাপ্পড় লাগাতে। কেন সে মরতে দিতে গেল সেই সর্বনেশে পাথরখানা ফিনকির হাতে! যাদের দেবার জন্যে হালদার মশায় বিশ্বাস করে তুলে দিলেন পাথরখানা ধনার হাতে, তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে এলেই তো চুকে যেত ল্যাঠা। কেন ওই দুর্বুদ্ধি হঠাৎ ঘাড়ে চাপল ধনার! মরণাপন্ন একজন মানুষ তাকে চোর জেনেও বিশ্বাস করে একটা কাজের ভার দিলেন। কাউকে না জানিয়ে ধনাকেই বিশ্বাস করলেন হালদার মশায়। আর ধনা তাঁর সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল! অথচ হালদার মশায় যদি না বাঁচাতেন সেদিন, তা হলে কিছুতেই পুলিস তাকে ছাড়ত না। মাল পাওয়া যাবার পরেও পুলিস সাহেব চোরকে চালান দিতে চেয়েছিল। হালদার মশায় সাহেবের হাতে ধরে তবে ছাড়ালেন। সেই জন্যেই তিনি বিশ্বাস করেছিলেন তাকে, মনে করেছিলেন ধনা অন্তত তাঁর সঙ্গে নিমকহারামিটা করতে পারবে না। নিমকহারামি করার ফল হাতে হাতে ফলল, সর্বনাশ হয়ে গেল ধনার। ধনার ইচ্ছে করতে লাগল রাস্তার গ্যাসপোস্টের গায়ে নিজের কপালটা ঠুকতে। এখন কোথায় যাবে সে ? কার কাছে গিয়ে ফিনকির কথা জিজ্ঞাসা করবে ?

হঠাৎ একটা মতলব খেলে গেল ধনার মাথায়।

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে তারাই আটকে রেখেছে

ফিনকিকে, যাদের কাছে পাথরখানা পৌঁছে দেবার ভার দিয়েছিলেন হালদার মশায়। কোনও রকমে হয়তো তারা জানতে পেরেছে যে পাথরখানা আছে ফিনকির হাতে। তাই তারা ধরে নিয়ে গেছে তাকে। কিছুই অসম্ভব নয়, যে রকম ভাবে সকলকে লুকিয়ে হালদার মশায় ধনাকে দিয়ে সরাতে চেয়েছিলেন পাথরখানা তাঁর নিজেরই বাড়ি থেকে, তাতে এটুকু তো স্পষ্ট জানা গেছে যে হালদার মশায়ের ছেলেরা জানতে পারলে কিছুতেই ওটা বাড়ি থেকে বেরতে দিত না। আর এটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে যাদের হাতে ও-জিনিস পাচার করতে চেয়েছিলেন হালদার মশায়, তাদের উনি ওঁর ছেলেদের চেয়েও বেশী বিশ্বাস করেন বা আপন জন মনে করেন।

কিন্তু কে তারা! কী সম্বন্ধই বা আছে তাদের সঙ্গে হালদার মশায়ের? এমনও তো হতে পারে যে তাদের খোঁজ করতে পারলেই ফিনকির খোঁজ পাওয়া যাবে। কী যেন ঠিকানাটা তাদের!

ধনা নিজের মনে বিড়বিড় করে আওড়ে নিল তাদের ঠিকানা। প্রথমে পার হতে হবে খালটা মা-কালীর ঘাট থেকে। তাবপর কোন্ দিক দিয়ে কোন্ গলির ভেতর যেতে হবে, কতবার ডাইনে বাঁয়ে ঘুরতে হবে, শেষে কোন্ বাড়ির কোন্ জানলাব নীচে দাঁড়িয়ে কী রকম ভাবে ডাকতে হবে, সব পাখি-পড়ানো করে পড়িয়ে দিয়েছিলেন তাকে হালদার মশায়। একটুও কষ্ট হবার কথা নয় সে বাড়ি খুঁজে বার করা। অতএব ধনা চলল ঘাটে, সর্বপ্রথম আগে সেই বাড়িতেই খোঁজ নিয়ে আসা যাক যে ফিনকিকে তারা ধরে রেখেছে কি না!

ধনা পার হল খাল। খালের ওপারে হয়তো পাওয়া যাবে তাব ফিনকিকে, এই আশায় সে খাল পার হয়ে গেল।

হালদার মশায়ও খাল পার হয়ে গেলেন মনে মনে। ওপারে তারা এপারে তিনি, মাঝে বয়ে চলেছে ওই খাল। শুকনো মরা খাল, কখনও এক ছিটে ময়লা-গোলা ঘোলা জল থাকে, কখনও একেবারে

খটখট করে। তবু ওই আদিগঙ্গা, আরও ভক্তিভরে যাকে বলা হয় কালীগঙ্গা। তীরে বসে লোকে চোদ্দপুরুষের পিণ্ডি দেয়, কেওড়াতলার ঘাটে নাভী বিসর্জন দেয়, আরও কত কী বিসর্জন দেয় ওই খালে। বিসর্জনের বিষে শেষ পর্যন্ত মা-গঙ্গা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলেন দেখতে দেখতে, যেমন হালদার মশায় নিজেও বিষের জ্বালায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছেন।

ওই খালের পচা পাঁকে কতটা পরিমাণ বিষ জমে আছে তাও যেমন কেউ বলতে পারে না, তেমনি হালদার মশায়ের ভেতরে যা জমা আছে তাও কেউ জানে না। জানে না তাই রক্ষে, নয়তো পালাত সকলে তাঁর ত্রিসীমানা ছেড়ে। এই যে ছেলেরা বউমায়েরা তাঁর আশেপাশে বসে রাত জাগছে, ওরা কেউ তিষ্ঠতে পারত না বিষের জ্বালায়। সহ্য করতে পারত না সেই আঁচ, যা সদাসর্বক্ষণ হালদার মশায়ের বুক পিঠ পাঁজরা শিরদাঁড়া ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে পোড়াচ্ছে। তিন কুড়ি বছরের ওপর মা-কালীর সেবায়েত কংসারি হালদার মশায় নিবিড় আঁধারের মাঝে ডুব দিয়ে হাতড়াতে লাগলেন, এমন কিছু একটা হাতে পাবার জন্যে আঁকু-পাঁকু করতে লাগলেন, যেটা ধরতে পারলে আবার তিনি ভেসে উঠতে পারবেন, আলোর মুখ দেখতে পারবেন, নিঃশ্বাস নিয়ে বুকটা জুড়তে পারবেন। কিন্তু, না, শেষ পর্যন্ত কিছুই ঠেকল না তাঁর হাতে, দম ফেটে যাবার উপক্রম হল। অবশেষে আবার সেই খাল, মরা খালের এপারে এতটুকু আলো নেই, হাওয়া নেই, কিচ্ছু নেই। কাজেই হালদার মশায় আবার খাল পার হয়ে গেলেন মনে মনে। গিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচলেন। এতটুকু হাওয়া নেই এপারে কংসারি হালদারের জন্যে, আলো তো নেই-ই। মরা খালের এপারটা অনেক কাল আগে মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, আশা-নিরাশা ভয়-ভক্তি প্রেম-করুণা পাপ-পুণ্য সব চেটেপুটে খেয়ে বসে আছে ওই কালামুখী কালী। ওর দোহাই দিয়ে হেন ব্যবসা নেই যা চলছে না এপারে। কংসারি হালদার মশায় তাঁর তিন কুড়ি বছরের কারবারের জের টানতে গিয়ে দেখলেন মজুদ তবিলে একটা কানাকড়িও পড়ে নেই। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে গেছে।

এলোমেলো ভাবনা সব দল বেঁধে হুল্লোড় করতে লাগল হালদার মশায়ের মাথার মধ্যে। এক দল এসে আসন পেতে বসতে না বসতেই আর এক দল এসে তাদের ঘাড়ের ওপর বসে পড়ল। যেন কালীবাড়ির কাঙালীভোজন, ভাবনাগুলো সব কাঙালী যেন। হালদার মশায়ের নজরটা একটু যাতে পড়ে তাদের ওপর, এই আশায় সবাই হুড়-হুজ্জত হেঙুলি-জেঙুলি জুড়ে দিয়েছে। ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলেন হালদার মশায়, ভয়ে একেবারে সিটিয়ে পড়ে রইলেন।

ওরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না তো তাঁর ভাবনাগুলোকে!

ওরা যে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি মেলে বসে আছে ওঁর চারিদিকে। একা হালদার মশায় কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু ওদের চোখে তো আঁধার নামে নি। সর্বনাশ, হালদার মশায়ের বুকের ভেতর থেকে তিন কুড়ি বছরের ইতিহাস সাকার রূপ ধরে বেরিয়ে পড়ে যদি ছেলে-বউদের চোখের সামনে! সর্বনাশ, সর্বনাশ হয়ে যাবে একেবারে।

"দূর, দূর, দূর হয়ে যা সব। দে দে সব দূর করে খেদিয়ে, তাড়া আমার সামনে থেকে। ঝাঁটা মেরে, জুতিয়ে বিদেয় কব্ সবাইকে।"

বিড়বিড় করতে লাগলেন হালদার মশায়। তারকারি হালদার ঝুঁকে পড়লেন বাপের মুখের ওপর।

"বাবা, বাবা গো, কী বলছ বাবা?"

চটকা ভেঙে গেল হালদার মশায়ের। চোখ মেললেন তিনি, কিন্তু মেলেও কিছু দেখতে পেলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন খুব ঠাণ্ডা গলায়, "রাত কত?"

রাত তখন অর্ধেকও পার হয় নি। শুনে হালদার মশায় আবার চোখ বুজলেন। ভয়টা কিন্তু কিছুতেই ছাড়ল না তাঁকে। ওরা কেউ দেখে ফেলে নি তো তাঁর ভাবনাগুলোকে! ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন হালদার মশায়। আঃ, পোড়া রাতটা কি আর পোয়াবে না কিছুতে! রাত পোয়ালে তাঁর চোখের আলো ফিরে পাবেন তিনি। তখন ভাল করে একবার ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবেন, ওরা কতটুকু কী জানতে পেরেছে! ভয়ানক সাবধান হয়ে গেলেন হালদার মশায়। না,

আর কিছুতেই ঘুমে না পেয়ে বসে তাঁকে। স্বপ্নে যদি কিছু প্রকাশ হয়ে যায় তাঁর মুখ থেকে! খুব সজাগ থাকতে হবে রাতটা, কারণ অত জোড়া সজাগ দৃষ্টির সামনে তিনি অন্ধ হয়ে পড়ে আছেন। এরা একটু বেরয় না কেন তাঁর ঘর ছেড়ে! একলা থাকতে পারলে এখন স্বস্তি পান তিনি। কিন্তু ওরা নড়বে না, কোনও মতেই আর তাঁকে একলা ফেলে রেখে যাবে না কোথাও। আঃ, কি যন্ত্রণা। রাতের যে এখনও অর্ধেকটা বাকী।

আর একটা রাত, অনেক বছর আগের এই রকমের এক রাতের অর্ধেকটা তখনও পার হয় নি। হালদার মশায় সে রাতে বাড়ি ফিরতেও পারেন নি। রাত একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল বাড়িতে ফিরতে তাঁর। তপু আর তারু সে বছরই বোধ হয় ম্যাট্রিক দেয়। ওদের মা সেই বছরেই রোগে পড়ল। আর হালদার মশায় সেই যে গোঁফ কামিয়ে ফেললেন, তারপর আর তিনি গোঁফ রাখেন নি।

হাঁ, সেই রাতটির অর্ধেকও তখন পার হয় নি। হালদার মশায়ের তু হাত ধরে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠেছিল সে। প্রাণপণে চেঁচালেও তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরয় নি তেমন। বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল যে, আওয়াজ বেরবে কেমন করে! কী বিপরীত লাশ! এক কুড়ি মানুষ লাগল কেওড়াতলায় নিয়ে যেতে। এক কুড়ি মানুষ জুটিয়েছিলেন হালদার মশায় সেই রাত্রেই। কিছুই অসম্ভব ছিল না তখন কংসারি হালদারের। একটি করে মদের বোতল, পাঁচটি করে টাকা আর এক জোড়া করে ধুতি চাদর প্রত্যেককে। এক কুড়ি মানুষ দিয়ে লাশ নিইয়েছিলেন তিনি কেওড়াতলায়। তিন টিন ঘি ঢেলে ঘণ্টা তিনেকের ভেতর কাবার করে দিয়েছিলেন সেই লাশ। বাস্, নেয়ে ধুযে যখন বাড়িতে ফিরেছিলেন হালদার মশায় তখন আর একটুও বাকী ছিল না রাত কাবার হতে। মনে পড়ে গেল, স্পষ্ট মনে পড়ে গেল হালদার মশায়ের যে তখন মায়ের বাড়ির পায়রাগুলো বুম-বুম-বক-বকম-কুম জুড়ে দিয়েছিল। বাড়িতে ঢোকার আগে বেশ কিছুক্ষণ তিনি ওদের বক-বকম-কুম শুনেছিলেন কান পেতে। সেই ভয়ঙ্কর নিযুতি-ভোরে পায়রার ডাক শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন হালদার মশায়। বিশ্রী রকম চমকে উঠেছিলেন তিনি, মনে হয়েছিল পায়রার বক-বকম-কুমের মধ্যে একটা কথা লুকিয়ে রয়েছে যেন। মনে হয়েছিল, পায়রাগুলো বক-বকম-কুম করে যা বলতে চাইছিল তাঁকে তা তিনি ধরতে পারছেন, মানে বুঝতে

পারছেন ওদের ভাষার। তখন থেকে তিনি পায়রা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। আরও একটা মুশকিল হয়েছে, তখন থেকে তিনি মায়ের বাড়ির পায়রার চোখের দিকে চাইতে পারেন না। অনেকবার তিনি এ প্রস্তাবও করেছিলেন যে ওই পায়রার গুষ্টিকে মায়ের বাড়ি থেকে বিদেয় করা হোক। অনর্থক ওই আপদে নোংরা করছে মায়ের মন্দির নাটমন্দির বারান্দা। কিন্তু পায়রা মায়ের বাড়ি থেকে তাড়ানো যায় নি। নেপালী ব্যাটাদের জ্বালায় সম্ভবও নয় পায়রা নিকেশ করা মায়ের বাড়ি থেকে। প্রত্যেকটি নেপালী এক জোড়া পায়রা এনে কপালে সিঁদুর লাগিয়ে ছেড়ে দেবে। ডালাধরা চার আনা দক্ষিণা পায় পায়রার কপালে সিঁদুর লেপে নিবেদন করে দেবার জন্যে। কাজেই মায়ের বাড়ি থেকে পায়রা দূর করা সম্ভব হয় নি কিছুতেই।

হালদার মশায় দেখতে লাগলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। অনেকগুলো পায়রা তাঁর চারদিক ঘিরে ঘাড় ফুলিয়ে নাচছে। নাচতে নাচতে তারা এগিয়ে আসছে তাঁর খুব কাছে, এসে মাথা বেঁকিয়ে তাঁর দিকে এক চোখে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে থাকছে কিছুক্ষণ। পায়রার চোখ কত রকমের হয়! সব পায়রার চোখই কি ওইরকম লালচে গোছের হয়! যেন ছোট্ট গোল এক টুকরো গোমেদ, পায়রার চোখে কি গোমেদ জ্বলে! কী রকম যেন একটা আতঙ্ক হয় পায়রার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলে, যেন খুব ছোট্ট একটু আগুনের ফিনকি লুকিয়ে রয়েছে সেই চোখে। সেই চাউনি বলতে চায়—জানি, সব জানি আমরা হালদার, কিছুই লুকোতে পার নি তুমি, কিছুই লুকনো যায় না আমাদের দৃষ্টি থেকে। আমাদের বলিদান হয়েই গেছে কিনা মায়ের স্থানে। বলিদানের পর আমরা বেঁচে আছি, তাই আমরা সব দেখতে পাই। দুনিয়ার যেখানে যা-কিছু ঘটছে তার কোনও কিছুই আমাদের দৃষ্টি থেকে লুকনো যায় না। যেখানে যে বলিই হোক, মায়ের বাড়ির ভেতর থেকে আমরা দেখি সেই বলি। দিনরাত অষ্টপ্রহর বলি দেখতে দেখতে আমাদের চোখ থেকে এই রকম লালচে ছটা ঠিকরয়।

হালদার মশায় হিসেব করে দেখেছেন, মানে অনেকবার মনে মনে

মিলিয়ে দেখেছেন ভূধর ভৌমিকের সেই চাউনির সঙ্গে পায়রার চোখের চাউনিরও যেন কেমন একটা মিল আছে। শেষ পর্যন্ত ভূধর ভৌমিক ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, ছটফট ধড়ফড় আছাড়-পাছাড় বন্ধ হয়ে গেল তার, গলা দিয়ে আর আওয়াজও বেরল না। শুধু লোকটা ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রক্তবর্ণ তুই চক্ষু, পায়রার চোখের চেয়ে অনেকগুণ বড় সেই চোখ, কিন্তু দৃষ্টিটা যেন ওই পায়রার দৃষ্টির মত। কিছুতেই ভুলতে পারেন না সেই চাউনি হালদার মশায়। জেগে বা ঘুমিয়ে বা স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ সেই রক্তবর্ণ চোখ তুটো তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আর তিনি সজোরে নিজের তুই চোখ চেপে ধরেন। তুই হাতে তুই চোখ কচলাতে থাকেন প্রাণপণে। এই ভাবে চোখ কচলাতে কচলাতেই তিনি রাতের দৃষ্টিটুকু খুইয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কী, দিনেও তিনি খুব স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পান না। তবু হালদার মশায় চশমা নেন নি, কারণ চশমা নিলে তিনি চোখ কচলাতে পারবেন না। চোখ কচলাতে না পারলে চোখের করকরানিতে প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে যে তাঁর। এই ভয়েই তিনি চশমা নেন নি।

চোখ তুটো আবার করকর করে উঠল হালদার মশায়ের। তু হাতে তিনি তু চোখ কচলাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারকারি বলে উঠলেন, “বাবা, তু ফোঁটা গোলাপজল দিয়ে দি তোমার চোখে। হাতটা একটু সরাও।”

গোলাপজল দেওয়া হয়ে গেল চোখে। একবার একটু জ্বালা করে উঠল চোখ তুটো, তারপর বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হালদাব মশায় আবার নিস্তব্ধ হয়ে পড়লেন।

ভূধর ভৌমিকও নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু চোখ তুটো সে বোজে নি। কেওড়াতলায় যখন তাকে তোলা হল চিতায় তখনও সে একভাবে চেয়ে ছিল। একটিবার মাত্র হালদার মশায় তার চোখের দিকে তাকিয়েছিলেন সে সময়। দেখেছিলেন, ভৌমিক তখনও সমানে চেয়ে রয়েছে। মনে হয়েছিল হালদার মশায়ের যে, ভৌমিক তাঁর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। সে চাউনিতে কী ছিল! ওই ভাবে তাঁর দিকে

তাকিয়ে কী বলতে চাইছিল ভৌমিক! কী সে বোঝাতে চাচ্ছিল তাঁকে!

কিছুই নয়, ভৌমিক তাঁকে কী বলতে পারে? তখন তাঁর কাছ থেকে কী আশা করতে পারে ভৌমিক? কী-ই বা তিনি করতে পারতেন সে সময়? সব শেষ করে দিয়ে তবে তাঁকে ডাকা হয়েছিল, বিষ তো তখন পেটেই ঢুকে পড়েছিল ভৌমিকের। বিষের চরম ফল ফলেই গিয়েছিল তখন। ডাক্তার বদ্যি জড়ো করে সেই অন্তিম মুহূর্তে কতটুকু লাভ হত? বাঁচাতে কি পারতেন তখন ভৌমিককে হালদার মশায়? কিছুতেই নয়, কিছুতেই ভৌমিক বাঁচত না তখন। শুধু হত খানিক কেলেঙ্কারি, থানা পুলিস কোর্ট কাছারি পর্যন্ত গড়াত ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত যদি প্রমাণও হত, কে কী উদ্দেশ্যে বিষ খাইয়েছিল ভূধর ভৌমিককে তা হলেই বা হত কী? কিছুই হত না, আসামীর গলার দিকে তাকিয়ে হাকিম নিশ্চয়ই ওই গলায় দড়ি বেঁধে ঝোলাবার হুকুম দিতে পারত না। নরম তুলতুলে মোমের মত গলাটা, পর পর তিনটি রেখা সাজানো রয়েছে গলায়। আর কী তার রঙ, পিচটুকু গিললেও দেখা যায় গলার ভেতর দিয়ে নামতে। ওই গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখার হুকুম দিতে পারত কোনও হাকিম! অসম্ভব, অসম্ভব, এ কি পাঁঠা-ছাগলের গলা নাকি যে ঝপ করে কোপ বসালেই হল!

আচ্ছা, প্রথমেই কি হালদার মশায়ের নজর পড়েছিল তার গলার ওপর! উঁহু, গলার দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি অনেক পরে। প্রথমে নজর পড়ল শুধু দুখানি হাতের ওপর, হাত দুখানি চেপে বসে রয়েছে তাঁর পায়ের পাতায়। নজর পড়তেই তাঁর পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কেমন যেন কেঁপে উঠল, সিরসির করে উঠল তাঁর শরীরের ভেতরটা। অত নরম অত ফরসা আর অমন গড়নের তুলতুলে হাতের স্পর্শ তাঁর কদাকার পায়ের ওপর, এ যেন তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। পা ছাড়িয়ে নেবারও শক্তি ছিল না তখন তাঁর। কাঠ হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে ছিলেন হালদার মশায়, একেবারে আড়ষ্ট কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে।

তারপর, তার অনেকক্ষণ পরে, আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠল একখানি মুখ। তখন দেখতে পেলেন হালদার মশায় চোখ দুটি। হাঁ, অনেকক্ষণ লেগেছিল তাঁর সেই চোখ দুটি দেখতে, অনেকক্ষণ পরে তিনি সরাতে পেরেছিলেন তাঁর নজর সেই চোখ দুটির ওপর থেকে। সামান্য একটু জলে ডুবে ছিল সেই চোখ দুটি তখন, জল কিন্তু একটুও গড়িয়ে নামে নি চোখ উপছে। জলে-ডোবা সেই চোখে কী যে পড়েছিলেন হালদার মশায়, তা এতদিন পরে আর ঠিক মনে করতে পারেন না। মানে, মনটা এখন তাঁর ভয়ানক বুড়ো হয়ে দরকচা মেরে গেছে কিনা!

চোখের ওপর থেকে নজর সরিয়ে আনতে গিয়ে নজর পড়ল সেই গলায়। গলাটাও তখন ওপর দিকে চিত হয়ে রয়েছে। তিনটি সরু রেখা পর পর সাজানো ছিল সেই গলায়। গলায় নজর পড়তেই তিনি চমকে উঠেছিলেন। না, ওরকম গলায় দড়ি বেঁধে ঝোলাবার ব্যবস্থায় কিছুতেই কংসারি হালদার সাহায্য করতে পারেন না।

বাস্, ও-পক্ষের যা কিছু বলার ছিল তা বলা হয়ে গেল। এ-পক্ষের বোঝাবার যতটুকু তাও বোঝা হয়ে গেল। ঠোঁট নাড়তে হল না, গলা দিয়ে স্বর বার করতে হল না, কোনও কিছু ইঙ্গিতও করতে হল না। চোখ দুটি গলাটি আর হাতের পাতা দুখানি সব বলে শেষ করে ফেললে। বললে অতি সাদা কথা। বললে, "এই গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেবে, এই কি তুমি চাও?"

তখন পা টেনে নিয়েছিলেন হালদার মশায়। তারপর ভূধর ভৌমিকের ম্যানেজার জয়গোপাল সামন্ত তাঁর সামনে দাঁড়াতে সাহস করেছিল। কিছুই নেন নি হালদার মশায়, কিছুই দাবি করেন নি তাদের কাছে। শুধু একটি কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, বছরে যে কটা পালা পড়বে তাঁর সে কটা পালা চালিয়ে দিতে হবে। অতবড় এস্টেট হাতে পেয়ে, বছরে আড়াই হাজার তিন হাজার খরচা করা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। নগদ এক আধলাও নিতে পারবেন না হালদার মশায়, একটি কানা কড়িও তিনি নেবেন না তাঁর নিজের জন্যে। তবে মায়ের পুজো দিতে হবে, বছরের পর বছর যতদিন কংসারি

হালদার বেঁচে থাকবেন ততদিন তাঁর পালা কটার খরচা দিতে হবে। ভূধর ভৌমিক যখন হালদার মশায়ের যজমান, আর সেই যজমান যখন তাঁর কাছে এসেই অপঘাতে মরল তখন যজমানের এস্টেট থেকে মায়ের পালার খরচাটুকু যদি পান তিনি চিরকাল, তা হলে যজমানের সৎকার-টুকু যাতে নির্বিঘ্নে নির্ঝঞ্ঝাটে সমাধা হয় তার ব্যবস্থা করতে রাজী আছেন তিনি।

ও-পক্ষও রাজী হয়ে গেল। যে-কোনও শর্তে তখন রাজী হত ওরা। ভূধর ভৌমিকের লাশ পোড়ানো হয়ে গেল। মুখে আগুন দিতে গেল স্ত্রী, ম্যানেজার গেল সঙ্গে। হালদার মশায়ও উপস্থিত রইলেন আগাগোড়া শ্মশানে। এবং উল্লেখযোগ্য একটি কর্ম সমাধা হয়ে গেল সেই সময়টুকুর মধ্যে। বড়লোক ভূধর ভৌমিক সস্ত্রীক তীর্থ করতে এসেছিলেন গোটা-চারেক তোরঙ্গ সুটকেস নিয়ে। ম্যানেজারেরও ছিল সুটকেস বিছানা। পাছে সব চুরি যায় এই ভয়ে হালদার মশায় সমস্ত সরিয়ে ফেললেন নিজের হেপাজতে। যাত্রী-তোলা বাড়িতে তো আর সে সব জিনিস বিশ্বাস করে রাখা যায় না! শ্মশান থেকে ফিরে আসবার ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরিয়েও দিয়েছিলেন তাদের যথাসর্বস্ব। শুধু খানকয়েক চিঠি খুঁজে পেতে বার করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। চিঠিগুলো পাওয়া গেল ভূধর ভৌমিকের বিধবা জয়জয়ন্তী দেবীর হাত-বাক্সের ভেতর। ওই চিঠি কখানি মাত্র সরিয়ে রেখেছিলেন হালদার মশায়। চাবিওয়ালাকে ডাকিয়ে বাক্স খুলিয়ে মাত্র চিঠি কখানি বার করে নিয়ে সোনাদানা সমস্ত ঠিকঠাক সাজিয়ে রেখে বাক্সটি ফেরত দিয়েছিলেন। হালদার মশায় ওঁদের তীর্থগুরু, তীর্থগুরু কখনও অবিশ্বাসী হতে পারে না। ওঁরা সব জিনিসপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিলিয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। একটি কানাকড়িও এধার ওধার হয় নি।

সেই চিঠিগুলো এখনও রয়েছে ওই দেয়াল-আলমারির ভেতর। এমনভাবে লুকনো আছে যে সহজে কেউ টের পাবে না। আর চাবিটা রয়েছে হালদার মশায়ের গদির তলায়। আছে তো ঠিক! হঠাৎ চাবির কথা মনে পড়তেই অস্থির হয়ে উঠলেন হালদার মশায়।

ডাক দিয়ে ফেললেন, "তারু, তারু আছিস নাকি রে এখানে ?"

পর-মুহূর্তে সাড়া পেলেন তিনি তাঁর মাথার কাছ থেকে, "হ্যাঁ বাবা, এই যে আমি। কষ্ট হচ্ছে নাকি আবার ? তু ফোঁটা ওষুধ খাবে ?"

একটু চুপ করে থেকে চাপা শ্বাসটুকু ফেলে হালদার মশায় বললেন, "না, কষ্ট হচ্ছে না। বলছিলুম, এবার একটু ঘুমিয়ে নে না তোরা। রাত আর কত বাকী রে ?"

তারকারি হালদার ঘড়ি দেখে বললেন, "পৌনে তুটো হল এখন। আমার তো ঘুম পাচ্ছে না বাবা, তুমি একটু ঘুমোও না। রাত তো আর বেশী নেই।"

হালদার মশায় আর বললেন না কিছুই। রাত বেশী নেই, এবার শুনতে পাওয়া যাবে তার গান, তারপর জানলার কাচ কখানা গুনতে পারা যাবে।

তার মানে আর খানিক পরেই আবার তিনি উদ্ধার পাবেন অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে। মাড়িতে মাড়িতে চেপে চোখ মেলে কান পেতে শুয়ে রইলেন হালদার মশায়। রাতের আর বেশী বাকী নেই।

ধনারও সেই রকম ধারণা হল। আকাশের যেটুকু ফালি তার নজরে পড়ল ছোট্ট জানলাটার গর্ত দিয়ে তা থেকে এই আন্দাজই করতে পারলে ধনা যে রাত কাবার হতে আর বড় বেশী দেরি নেই। একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে, কোথায় কী অবস্থায় যে ফিনকির কাটছে এই রাতটা! কোথায় রইল ফিনকি আর কোথায় রইল ধনা! অনর্থক খাল পার হয়ে এ বাড়িতে মরতে এসে তাকে বন্দী থাকতে হল সারাটা রাত! খামকা এ হেন ফ্যাসাদে পড়ে যেতে হবে জানলে কি ধনা পার হত নাকি খাল! হারামজাদা খুনের পাল্লায় পা দিচ্ছে এ ধারণা করতে পারলে টপকাতে যেত নাকি সে এ বাড়ির পাঁচিল! কী প্যাঁচেই না পড়ে গেছে ধনা মিছামিছি! রাত তো পোয়াল বলে, এখন এই জাল কেটে বেরবে কী করে সে, সেই হল কথা। সকাল হলে কেউ না কেউ এ ঘরের শিকল খুলবে, আর তখন দেখতে পাবে তাকে। তারপর যে কী ব্যবস্থা করবে এরা! পরিণতিটা ভাবতে গিয়ে ধনার মাথা খারাপ হবার যোগাড় হল। দু হাতে সে নিজের মাথার দু মুঠো চুল ধরে টানাটানি করতে লাগল।

অথচ ভেবে দেখতে গেলে কোনও অপরাধই নেই তার। হালদার মশায়ের নির্দেশমত বাড়ি খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয় নি তাকে। বাড়ির পাশে পৌঁছে রাস্তার ধারের ছোট জানলাটাও সে দেখতে পেয়েছিল। জানলাটায় টোকা দিলে হয়তো কেউ খুলেও দিত বাড়ির দরজা। কিন্তু তারপর তাকে বলত কী ধনা? হালদার মশায় বলে দিয়েছিলেন, পাথরখানা হাতে দিলেই এরা সব বুঝতে পারবে। কিন্তু পাথর দিতে তো আসে নি সে। এসেছে ফিনকিকে খুঁজতে। ফিনকি যদি বন্ধ থাকত এই বাড়িতে তা হলে এরা তা মানত নাকি! না, তাকে আদর করে ঢুকতে দিত বাড়িতে! ঢুকতে হয়তো দিত, কিন্তু ফিনকিকে নিয়ে বেরতে দিত না। কাজেই সব দিক বিবেচনা

করে পাঁচিল টপকানোই উচিত বলে বিবেচনা করলে ধনা। পাঁচিল টপকাতেও একটু কষ্ট হল না। যে সরু পথটির ওপর এ বাড়ির সদর-দরজা, সে পথের দু ধারের দেওয়ালে দু পা দিয়ে অনায়াসে সে উঠে পড়ল পাঁচিলের মাথায়। তারপর আর কিছু বিবেচনা না করেই আরও অনায়াসে নেমে পড়ল বাড়ির ভেতর। নেমেই এমন এক কাণ্ড ঘটছে দেখল ঘরের মধ্যে যে, বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেল তার। আর একটু হলেই চেঁচিয়ে উঠত ধনা। ভাগ্যে ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েমানুষটার গলা ছেড়ে দিয়ে লোকটা এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল, নয়তো তখনই হয়তো চেঁচিয়ে উঠে ধরা পড়ে যেত সে। তখনই হয়তো সে পালাত, কিন্তু তারপর লোকটা এমন সব কথা বলতে লাগল যার একটুখানি কানে যেতেই সে নিঃশব্দে উঠে পড়ল বারান্দায়। একেবারে ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। কারণ ভয়ানক চাপা স্বরে আর সাপের মত হিসহিস শব্দ করে শাসাচ্ছিল লোকটা মেয়েমানুষটাকে। খুব কাছে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল বলেই খানিকটা তবু বুঝতে পেরেছিল ধনা। উঃ, কী সাংঘাতিক কথা, হালদার মশায়কে খুন করতে চায় ও! এরা কিন্তু জানেও না যে হালদার মশায় মরতে শুয়েছেন। হয়তো এতক্ষণে মরেও গেছেন তিনি। দিনের বেলা তো একটা টাল গেছে। ওই রকমের আর একটা টাল যদি এসে থাকে রাতে, তা হলে তা আর সামলাতে হয় নি হালদার মশায়কে। এতক্ষণে তাঁকে কেওড়াতলায় নিয়ে তোলা হয়েছে।

ধনা ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল হালদার মশায়ের কথা মনে পড়তেই। কী ভয়ানক অবস্থায় নিজে পড়েছে তা ভুলে সে হালদার মশায়ের কথাই ভাবতে লাগল। আহা রে, বুড়ো মানুষটার ও-দশা হবার জন্যে ধনাই দায়ী। মায়ের মন্দিরের ভেতর পেছন থেকে ধাক্কা না দিলে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন না হালদার মশায়। অবশ্য ধাক্কা না দিয়ে উপায়ও ছিল না ধনার। হালদার মশায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আর সেই ফাঁকে সে একটানে খুলে নিতে পেরেছিল হারছড়াটা বউটির গলা থেকে। হালদার মশায়কে ফেলতে না পারলে সাধ্য ছিল না কি

ধনার তাঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে তাঁরই যজমানের গলা থেকে হার ছিনিয়ে নেওয়ার ! যে বাঘা হালদার, বুড়ো হলে হবে কী, এখনও ওঁর নজর থেকে হাজারটা ধনার মত ওস্তাদের ওস্তাদি পার পায় না।

যে ধনা এতবড় সর্বনাশটা করলে তাঁর, পিঠের শিরদাঁড়াটা জখম করে জন্মের শোধ বিছানায় শোয়ালে, তাকেই তিনি বিশ্বাস করে গুরুতর কাজের ভার দিলেন। আর কাউকে বিশ্বাস হল না হালদার মশায়ের, ধনাকেই বিশ্বাস হল। কাউকে না জানিয়ে চাকরকে দিয়ে ডাকিয়ে পাঠালেন তাকেই। সে যেতেই তাকে চুপিচুপি তেতলায় উঠে ঠাকুরঘর থেকে সর্বনেশে পাথরখানাকে নামিয়ে আনতে বললেন। তারপর তার দু হাত ধরে ভার দিলেন পাথরখানাকে এই বাড়িতে পৌঁছে দেবার। কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে মরণাপন্ন হালদার মশায়ের সঙ্গে। তাঁর শিরদাঁড়া ভাঙবার জন্যে যে ধনা দায়ী, সেই ধনাকেই তিনি উদ্ধার করলেন পুলিসের হাতে ধরে। সেই ধনাই করে বসল তার সঙ্গে এতবড় নিমকহারামিটা ! এর ফল হাতে হাতে ফলল, ফিনকি গোল্লায় গেল, রাতটা কাবার হলেই সে নিজেও গোল্লায় যাবে।

যাক, তাতেও আর দুঃখ নেই ধনার ; কিন্তু হালদার মশায়ের শেষ সময় যদি সে পৌঁছতে পারত তাঁর কাছে, তা হলে সকলের সামনে নিজের সব দোষ কবুল করে তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমাটা চেয়ে নিতে পারত। কিন্তু সে উপায়ও আর নেই।

আর একটা টাল যদি এসে থাকে আবার, তা হলে হালদার মশায়কে আর সামলাতে হয় নি। এতক্ষণে তাঁকে কেওড়াতলায় নিয়ে তোলা হয়েছে।

আর এ ব্যাটা খুনে এখানে মতলব ভাঁজছে তাঁকে খুন করবার। আর একটু হলেই মেয়েমানুষটাকে শেষ করে দিয়েছিল আর কি! যেভাবে দেওয়ালের সঙ্গে গলাটা চেপে ধরেছিল মেয়েমানুষটার, যেরকম ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল মেয়েমানুষটার চোখ দুটো তাতে আর মিনিট-খানেক বড়জোর টিকত ওর দম। উঃ, গলা টিপেই খতম করে দিত ব্যাটাচ্ছেলে একটা মেয়েমানুষকে!

কিন্তু ওই খুনেটার সঙ্গে ও একলা এ বাড়িতে থাকেই বা কেন! আর খুনেটা ওকেই বা দায়ী করছে কেন, হালদার মশায়ের কাছে কী সব চিঠিপত্র আছে তার জন্যে! গলা ছেড়ে দিয়ে লোকটা হিস হিস করে যে-সব কথা বলে শাসালে ওকে, তা স্পষ্ট শুনেছে ধনা। হাঁপাতে হাঁপাতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগল লোকটা, "কেন আর আসে না সে? কেন আসে না? তুই তাকে মানা করেছিস আসতে। তুই তার হাতে তুলে দিয়েছিলি আমার চিঠিগুলো। সেইগুলো হাতে পেয়েই তো তার এত তড়পানি। এতগুলো বছর ধরে হাজার হাজার টাকা ব্যাটা আদায় করলে। রোজ ভোরে এসে সে তোকে চরণামৃত খাইয়ে যায়। চরণামৃত, আহা রে, চরণামৃত। একটি দিন বাদ পড়ে না গুরুদেবের ভোরবেলা এসে চরণামৃত দিতে! শিষ্যার ওপর কী দরদ গুরুর! মনে করেছিলি, আমি কিছু বুঝি না, না? আমার চোখে ধুলো দিয়ে বেশ কাটছিল এতকাল, মুখ বুজে সব সহ্য করেছি আমি। যতবার জিজ্ঞাসা করেছি চিঠিগুলোর কথা ততবার মিথ্যে কথা বলেছিস, সব ঠিক আছে। সব ঠিক আছে তোর সেই গুরুবাবা হালদার হারামজাদার কাছে। চিঠিগুলো কিছুতেই আদায় হল না এতদিনে, এখন সে নিজে ডুব মারলে। শুনে রাখ্, হারামজাদী মেয়েমানুষ, শেষবারের মত শুনে রাখ্, আজও তোকে ছেড়ে দিলুম। কিন্তু সেই হালদারটার কাছ থেকে চিঠিগুলো যদি আদায় করতে না

পারিস তা হলে পার পাবি না আমার হাত থেকে। নিজের হাতে বিষ খাইয়ে মেরেছিলি স্বামীকে, সব করতে পারিস তুই। তা বলে মনে করিস নি, আমার হাত থেকে রেহাই পাবি।"

শেষ কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ লোকটা পেছন ফিরে ছুটে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। ভাগ্যে ধনা সট্ করে ঢুকে পড়তে পেরেছিল এই ঘরে, নয়তো তখনই তার দফারফা হয়েছিল আর কি!

কিন্তু এ ঘরে ঢোকাই কাল হল তার। আর কী ঘটে তা শোনবার আশায় ঘাপটি মেরে বসে রইল সে অন্ধকার ঘরের ভেতর। ঘটল আর কচু, কিছুক্ষণ পরে কোথা থেকে কার বিকট নাকের ডাক শোনা যেতে লাগল। ধনা তখন ভাবছে ঘর থেকে বেরিয়ে সরে পড়বার কথা। সরে আর তাকে পড়তে হল না, পাশের ঘর থেকে মেয়েমানুষটা বেরিয়ে এসে এ ঘরের দরজা টেনে শিকল তুলে দিয়ে চলে গেল। অন্ধকারের ভেতর থেকে আড়ষ্ট হয়ে চেয়ে রইল ধনা, একটি আঙুল তুলেও বাধা দিতে পারলে না।

তখন একটু চেষ্টা করলেই হত, সারাটা রাত এভাবে বন্ধ থাকতে হত না এ বাড়িতে। মেয়েমানুষটাকে এক ধাক্কায় এক পাশে সরিয়ে দিয়ে যদি সে তখন লাফিয়ে পড়ত ঘরের বাইরে, তা হলে এ বাড়ি থেকে উদ্ধার পাওয়া হয়তো খুব একটা কঠিন কাজ হত না। হৈ-হৈ করে লোক জমা করত এরা, ততক্ষণে ধনা গলি কটা পার হয়ে হয়তো নেমে পড়তে পারত খালে। কিন্তু মেয়েমানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হয়ে গেল সে। দরজা বন্ধ করে শিকল তুলে দিয়ে চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধনা সেই মুখখানার কথাই ভাবতে লাগল। অমন মুখ, অমন চোখ যার, সে কি কখনও স্বামীকে বিষ খাইয়ে মারতে পারে? সেই হারামজাদা খুনে মাতালটা তো বলেই গেল, নিজের হাতে বিষ খাইয়ে মেরেছিলি স্বামীকে। হাত দুখানাও ধনা দেখতে পেয়েছিল দরজা বন্ধ করার সময়। ওইরকম হাত দিয়ে কেউ বিষ দিতে পারে! অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব কাণ্ড। ও মানুষ কখনও ও সব কাজ করতেই পারে না। চোর ডাকাত খুনে অনেক দেখেছে

ধনা, ধনাকে আর শেখাতে হবে না কিছু। মানুষ দেখে সে ঠিক বলে দিতে পারে যে তার দ্বারা কী সম্ভব, কী অসম্ভব। ও মানুষ, যার ওই রকম ঠাণ্ডা মুখ, ওই রকম গোবেচারা গোছের চোখ, আর অত সুন্দর ছোট ছোট যার হাত, সে করবে মানুষ খুন! বললেই হল আর কি যা-তা অমন মানুষের নামে! নিশ্চয়ই ওই শালা খুনেটার একটা কিছু বদ মতলব আছে পেটে। এ বেচারাকে এখানে আটকে রাখে নি তো! এমনও তো হতে পারে যে, কোনও কারণে ও পালাতে সাহস করছে না ওই খুনেটার হাত থেকে! গলা টিপে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল, তবু টুঁ শব্দটি করলে না। আর কী আস্পর্ধা ওর! অমন মেয়েছেলের গায়ে ও হাত তোলে?

খেপে গেল একেবারে ধনা। পেছন থেকে তখনই সেই খুনেটার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েছেলের গলা টিপে ধরার উপযুক্ত ফল দিতে পারে নি এই আপসোসে সে নিজের হাত কামড়াতে লাগল। একবার যদি ছাড়া পায় এই ঘর থেকে তা হলে আগে সেই খুনেটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে তবে সে বেরবে এই বাড়ি থেকে, নয়তো লোকে যেন তাকে ধনা বলে না ডেকে শুয়োর পাঁঠা ছাগল বলেই ডাকে। আর কিছু না পারুক, কামড়ে এক খাবলা মাংসও তো ছিঁড়ে নিতে পারবে সেই হারামজাদার শরীর থেকে। মেয়েমানুষ খুন করার মতলব! আচ্ছা, দাঁড়া ব্যাটা, বেরই একবার এই ঘর থেকে। রাগে ক্ষোভে জ্ঞানহারা হয়ে ধনা চেঁচিয়েই বলে ফেললে, "মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলা বার করব শালা তোমার, দাঁড়াও একবার বেরিয়ে নিই এই ঘর থেকে।"

ভয়ানক চমকে উঠল ধনা।

নিজের বলা কথাটা যে মুহূর্তে ঢুকল কানে, সেই মুহূর্তে সে হুঁশ ফিরে পেল। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস বন্ধ করে কান পেতে রইল আর কোনও সাড়াশব্দ শোনার আশায়। কেউ শুনতে পায় নি তো! এ

হে-হে-হে, করলে কী সে অন্যমনস্ক হয়ে ! যদি কেউ শুনতে পেয়ে থাকে তা হলেই হয়েছে কাজের শেষ। আগে ডেকে ডুকে লোক জড়ো করবে, তারপর ঘরের দরজা খুলবে। কোনও সন্দেহ না করে যদি কেউ খুলত ঘরের দরজা তা হলেও একটা উপায় হয়তো হত। আচমকা লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দৌড়ে পালাতে পারা হয়তো সম্ভব হত। কিংবা অন্ধকারে এক কোণে লুকিয়ে বসে থেকে এক ফাঁকে সকলের নজর এড়িয়ে সরে পড়া, তাও হয়তো অসম্ভব হত না। কিন্তু এ কী করলে সে ? নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে বসল !

অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল। ধনার মনে হল, অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল নির্বিঘ্নে। অন্য কোনও সাড়াশব্দ উঠল না কোথাও থেকে। তখন সে দম ফেললে আস্তে আস্তে। যেন তার নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ-টুকুও কেউ না শুনে ফেলে। নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসেছে আর অমনি শুনতে পেলে—ঠিকই শুনতে পেলে ধনা, দরজার বাইরে থেকে কে যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। নিঃশব্দে সে সরে এসে দাঁড়াল দরজার গায়ে। কান চেপে ধরল দরজার ওপর। তারপর স্পষ্ট শুনতে পেলে দুবার।

"কে তুমি ? ঘরের ভেতর তুমি কে ?"

খুব চুপিচুপি দুবার করা হল সেই প্রশ্ন। চুপ করে ধনা ভাবতে লাগল জবাব দেবে কি না ! আবার তার কানে গেল, "বল তুমি কে, নয়তো লোক ডাকব।"

ধনা বুঝতে পারলে মেয়েমানুষের গলা। তখন তার সাহস হল। সেই রকম চুপি চুপি সে বললে, "দরজাটা খুলে দাও মা, সব বলছি।"

"না, আগে বল তুমি কে ? কেন এসেছ এ বাড়িতে ? এ ঘরে ঢুকেছ কখন ?"

ধনা কাঁদ-কাঁদ গলায় বলল, "আমি হালদার মশায়ের কাছ থেকে এসেছি মা, তিনি মরতে বসেছেন। আমায় একখানা পাথর দিয়েছেন আপনাকে দেবার জন্যে।"

বাস্, আর একটুও সাড়াশব্দ নেই। বেশ কিছুক্ষণ কাটল নিঃশব্দে।

তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা একটু ফাঁক হল। তখন শুনতে পেল ধনা, "সাবধান, একটুও শব্দ যেন না হয়। বেরিয়ে এস বাইরে।"

একটুও শব্দ না করে দরজাটা আর একটু ফাঁক করে বেরিয়ে এল ধনা। সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ল তার একখানা হাত। কানের কাছে শুনতে পেল ধনা, "চল, আমরা পালাই এখান থেকে। সাবধান, খুব সাবধানে এস।"

হাতখানা ছাড়া পেল না ধনার। তার হাত ধরেই তাকে নামিয়ে আনা হল বারান্দা থেকে। সদর-দরজার খিল খোলা হল নিঃশব্দে। সদর-দরজা পেরিয়ে এসে নিঃশব্দে আবার সেটা টেনে দেওয়া হল।

তারপর গলি। গলির পর গলি পার হয়ে চলল তুজনে নিঃশব্দে। শেষে খাল দেখা গেল। তখন ধনার হাতখানা ছাড়া পেলে।

আর তখন শুনতে পেল ধনা একটি অনুরোধ। অনুরোধ নয়, যেন ভিখিরী ভিক্ষে চাইছে তার কাছে: "আমাকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে যাবে বাবা?"

একটা ঢোক গিলে ধনা বললে, "চলুন মা, সাবধানে আসুন আমার হাত ধরে। এখানটা ভয়ানক পেছল। জল সরে গিয়ে পলি পড়েছে কিনা। খালে এক হাঁটুজলও নেই। আসুন, আমরা এখান দিয়ে পেরিয়ে যাই।"

সাবধানে তাঁকে নামালে খালে ধনা, সাবধানে তুলে নিয়ে এল এপারে। এপারে ওঠার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে, একটা তারা খুব জ্বলজ্বল করে জ্বলছে মাথার ওপর। মনে হল যেন রাতটা সত্যিই শেষ হয়ে এসেছে।

ফিনকিরও তাই মনে হল।

আস্তে আস্তে সে উঠে বসল বিছানায়। নরম সবুজ আলোয় ঘরটা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে বুড়ী ঝিটা নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছিল, ওপাশের জানলার পর্দার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল খানিকটা আকাশ। সেই আকাশটুকুতে জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল একটা তারা তারাটির দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর ফিনকির মনে হল, রাত শেষ হতে চলেছে।

ঠিক এই রকম ভোর রাতেই তার মা উঠে পড়েন রোজ, উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার খুঁটি ঠেস দিয়ে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তখন তাঁর ঠোঁট নড়তে থাকে। অনেক দিন ভোরে ফিনকিও উঠে গিয়ে বসেছে মায়ের পাশে, মায়ের মত তাকিয়ে থেকেছে ওই তারাটির দিকে। কিন্তু ঠোঁট নাড়তে পারে নি। নাড়বে কী করে, ফিনকি তো আর মায়ের মত জপ করতে জানে না। তাই সে চুপ করে বসে থেকেছে মায়ের মুখখানির দিকে চেয়ে, অনেকবার ফিনকির মনে হয়েছে, ওই জ্বলজ্বলে তারাটির মত তার মায়ের মুখখানিও জ্বলজ্বল করছে। রোগা শুকনো গালের হাড়-ঠেলে-ওঠা মায়ের মুখখানি অনেকটা ওই তারাটির মতই। আর একটু ভাল করে দেখবার জন্যে খাটের ওপর থেকে নেমে পড়ল ফিনকি। নেমে আগে কাপড়খানা খুঁজে বার করলে বিছানা থেকে। একটা খুব পাতলা কাপড়ের সাদা শেমিজ আর এক-খানি চকচকে কালোপাড় কাপড় ফিনকিকে পরানো হয়েছিল। ফিনকির মনে পড়ে গেল, পাড় দেখে সে বলে ফেলেছিল, 'ওমা, এ যে ধুতি!' শুনে সেই বউটির কী হাসি, হাসতে হাসতে বলেছিলেন তিনি, 'তা তো বটেই, তুমি হলে গিন্নীবান্নী মানুষ, তুমি কি ধুতি পরতে পার!' বলে সেই ধুতিখানিই ফিনকিকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য অনেকক্ষণ তার হুঁশ ছিল না।

বিছানা থেকে কাপড়খানা টেনে নিয়ে কোমরে জড়াতে জড়াতে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল ফিনকি, তারপর আর কী কী হয়েছিল ! কে কে যেন এসেছিল তার কাছে ! আবছা আবছা যেন সে দেখেছিল অনেক ব্যাপার, একজন সাহেব গোছের লোক এসে বসে ছিল তার বিছানার ওপর, তখন খুব লেগেছিল তার হাতে। হঠাৎ ফিনকি কাপড় পরা বন্ধ করে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের ওপর দিকটায় হাত বুলতে লাগল। একটু যেন ফুলে আছে জায়গাটা। আরও ভাল করে সব মনে করবার জন্যে সে মুখ নিচু করে ছোট্ট কপালখানি কুঁচকে থেমে রইল কিছুক্ষণ। কপাল কোঁচকাতে গিয়েই বোধ হয় টান পড়ল কপালে। তখন তার হাত গিয়ে ঠেকল কপালের ওপর।

এ কী !

কপালের বাঁ ধারে কী একটা সেঁটে বসে রয়েছে যেন !

হঠাৎ আবার মাথাটা যেন গুলিয়ে গেল ফিনকির। পড়েই যেত আর একটু হলে, কোনও রকমে বিছানায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলালে। দাঁড়িয়ে রইল সেই ভাবে নিজের পায়েব পাতাব দিকে তাকিয়ে। একটু একটু করে অনেক কথা তার মনে পড়ে গেল। সকাল থেকে যা যা ঘটেছে, সব ঠিকঠাক পর পর গুছিয়ে মিলিয়ে নিলে ফিনকি মনে মনে। এ বাড়িতে আসাব পর থেকে কিন্তু কেমন যেন সব ওলটপালট . গোলমাল হতে লাগল। যেন ঘুমের ঘোরে সে দেখেছে অনেক কিছু, কিন্তু কিছুই ঠিক মনে করতে পারছে না। সেই ভদ্রলোকটিকে মনে পড়ল, যিনি তাঁর বউয়ের হাতে ফিনকিকে দিয়ে নিজে কাজে বেরিয়ে গেলেন। বউটি তাকে এই কাপড় জামা পরালে, পরিয়ে এই বিছানায় এনে শুইয়ে দিলে। বোধ হয় তখন খানিকটা দুধও খেয়েছিল ফিনকি। তারপর কী হল !

বেশ চেষ্টা করে দেখলে ফিনকি যদি মনে করতে পারে কী কী হয়েছিল তারপর। কিন্তু না, আর যেন কিছু হয়নি।

ওঃ, এবার মনে পড়েছে।

তারপর যেন আর একবার দেখেছিল সে সেই ভদ্রলোকটিকে আর

তাঁর বউকে। হাঁ, ঠিক দেখেছিল, ওঁরা বসে ছিলেন এইখানেই, এই বিছানার ধারেই। এই সবুজ আলোটা থাকার দরুনই ফিনকি ভাল করে চিনতে পারে নি তাঁদের।

তবে শুনতে পেয়েছিল ফিনকি ওঁদের কথা। চুপি চুপি নয়, তবে চাপা গলায় ওঁরা কথাবার্তা বলছিলেন।

কী বলছিলেন যেন!

হাঁ, হাঁ, এইবার মনে পড়েছে সব। হাসপাতাল, কাল সকালে হাসপাতালে দিতে হবে।

ভয়ানক রকম চমকে উঠল ফিনকি, যেন ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে সে কোনও কারণে। ব্যাকুল চোখে তাকাতে লাগল ঘরের চারদিকে। আবার তার নজর গিয়ে পড়ল জানলার ফাঁক দিয়ে আকাশে। আকাশের গায়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে তারাটি। আর একটুও দেরি করলে না ফিনকি, কালোপাড় পাতলা কাপড়খানির আঁচলটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে ফেললে। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ঘুমন্ত বুড়ীকে ডিঙিয়ে যেতে হল, বুড়ীটা আবার তখন বিড়বিড় করে কী বকছে! বুড়ীর বকুনি শুনে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ল ফিনকি। না, বুড়ীটার ঘুম ভাঙে নি, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই সে ঝগড়া করছে যেন কার সঙ্গে। করুক আরও কিছুক্ষণ, ফিনকি দরজার পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিলে বাইরের দু দিক। তারপর পর্দার বাইরে পা দিলে।

ঘর থেকে বেরিয়েই বারান্দা, বাঁ পাশে বারান্দার শেষ দিকে একটা দরজা। ফিনকির সব মনে পড়ে গেল। ওই দরজা দিয়ে বাইরের ঘরে ঢোকা যাবে। ওই ঘরেই সেই মুশকো মিন্‌সেটা ফিনকিকে এনে নামিয়ে দিয়েছিল ভদ্রলোকের টেবিলের সামনে। ওই ঘরটায় এখন ঢুকতে পারলে হয়। তারপর ওধারের দরজা যদি খুলতে পারা যায় তা হলেই রাস্তা।

পাতলা অন্ধকারে দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চলল ফিনকি। পর্দা সরিয়ে ঠেলা দিতে খুলে গেল দরজাটা। ঘরের মধ্যে ভয়ানক

অন্ধকার। তাতেও ভয় পেলে চলবে না ফিনকির, থামলেও চলবে না। অন্ধকারেই সে পা ঘষে ঘষে এগিয়ে চলল। দু হাত সামনে মেলে দিয়ে এগতে লাগল। হাতে ঠেকল প্রথমবার একটা চেয়ারের পিঠ, চেয়ারখানা ঘুরে যেতেই টেবিলের কোণায় হাত ঠেকল। তারপর আর একটু এগতেই দেওয়াল পাওয়া গেল। এইবার দেওয়াল ধরে ধরে ডান দিকে খানিকটা যেতেই পাওয়া গেল দরজাটা। সন্তর্পণে দরজার খিল খুলে দেওয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রাখলে ফিনকি। কিন্তু টেনে দেখলে, দরজা খোলে না। ওপরে বোধ হয় ছিটকিনি আছে। ওপর দিকে হাত বুলতে ছিটকিনি হাতে ঠেকল। খুট করে একটু শব্দ হল ছিটকিনি খুলতে। কুঁচ করে একটু শব্দ হল দরজাটা ফাঁক করতে। দরকার নেই বেশী ফাঁক করে, যদি আবার শব্দ হয়! ঠিক যতটুকু ফাঁক করলে ফিনকি গলে বেরিয়ে যেতে পারবে ততটুকুই ফাঁক হল দরজার কপাট। আড় হয়ে বেরিয়ে এল ফিনকি।

আবার রাস্তা। ওপরে খোলা আকাশ। সেখানে মায়ের মত মুখের তারাটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বুকটা ভরে ফেললে ফিনকি। মুখ তুলে আর একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল।

তারাটা হাসছে। ফিনকির কাণ্ড দেখে মুখ টিপে হাসছে তারাটা। যেমন তার মা হাসেন ফিনকি যখন রাগারাগি করে হাত পা ছুঁড়তে থাকে, তেমনি ভাবে মুখ টিপে হাসছে যেন আকাশের তারাটাও।

কী জানি কেন, হঠাৎ হু-হু করে কেঁদে উঠল ফিনকি। পর-মুহূর্তেই সে জোর করে থামিয়ে ফেলল তার কান্না। থামিয়ে মাথা নিচু করে ছুটতে লাগল। কোন্ দিকে যাচ্ছে, কোথায় পৌঁছবে, এ সমস্ত ভাবনা চিন্তা তার মাথাতেই এল না। ছুটল ফিনকি জনমানবশূন্য পথে। ছুটতেই হবে যে তাকে, পালাতেই হবে, নয়তো আর রক্ষে নেই। ধরা পড়লেই ওরা তাকে দিয়ে আসবে হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে যাবে না ফিনকি, কিছুতেই সে ধরা দেবে না। ছুটে গিয়ে এখনই তাকে পৌঁছতে হবে তার মায়ের কাছে।

ধরা দেওয়া চলবে না কিছুতে।

এক ঘর মানুষের সামনে আত্মপরিচয় দেওয়াটা মহাভুল হয়ে গেছে। কংসারি হালদার মরছে শুনে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে পাথরখানা আদায় করতে যাওয়াটা মোটেই ভাল কাজ হয় নি। এতক্ষণে সবাই জানতে পেরে গেছে যে পাগলাটা কে। সর্বাঙ্গে ইট-পাটকেল ঝুলিয়ে কে পড়ে থাকে শ্মশানে, কে রোজ নিশিরাতে মায়ের দরজায় মাথা ঠুকে নকুলেশ্বরের ঘুম ভাঙিয়ে কালীঘাটের পথে গান গেয়ে বেড়ায়! এখন পাগলার পরিচয় জানতে আর বাকী নেই কারও। শয্যাশায়ী হালদারকে যখন চেপে ধরেছে সকলে পাগলার পরিচয় জানার জন্যে, তখন সে বেচারা নিশ্চয়ই বলে ফেলেছে সব কথা। এতদিন পরে ছাড়তেই হল কলিতীর্থ কালীঘাট। আর মাকে গান শোনানো চলবে না, ভৈরবের ঘুম ভাঙাতে আর কেউ নিশিরাতে আসবে না। আর কেউ কখনও পাগলাকে কালীঘাটে দেখতে পাবে না।

রইল ওরা।

ওরা রইল, সবাই রইল মায়ের আশ্রয়ে। বারোটা বছর পূর্ণ হতে আর মাত্র তিনটি বছর বাকী। বারো বছরের ব্রতপূর্ণ হলে বাক্‌সিদ্ধ হওয়া যেত, শ্রুতিধর হওয়া যেত, জাতিস্মর হওয়া যেত। এই কালীঘাট আবার জেগে উঠত তা হলে, দেশ-দেশান্তরের মানুষ মায়ের মহিমা জানতে পেরে ছুটে এসে আছড়ে পড়ত এই তীর্থে। কলিতীর্থের সমস্ত কলুষ যেত ধুয়ে। ওই মরা আদিগঙ্গায় আবার জোয়ার ডাকত, সেই জোয়ারের জল কালীঘাটের কূল ছাপিয়ে উঠে সব ধুয়ে মুছে সাফ করে নিয়ে যেত—দীনতা হীনতা জাল জুয়াচুরি পাটোয়ারী বুদ্ধি, সমস্ত। তখন লোকে এই তীর্থে এসে মোকদ্দমা জেতবার জন্যে ঘুষ দিত না মাকে, নিজের ছেলের ব্যামো ভাল হবার কামনায় ছাগলের ছেলের গলা কাটতে চাইত না। মানুষ তখন কালীঘাটকে ছাগল-বেচার মস্ত

বড় হাট বলে মনে করত না। ছাগলেরা তখন কালীঘাটে মানুষ কিনতে আসত না। কারণ কলিতীর্থ কালীঘাট থেকে তখন মানুষ বেচা-কেনার পাটই উঠে যেত।

একদা এই ঘাটে সত্যিই মানুষ কেনা-বেচা হত।

গঙ্গাটা তখন এত বড় ছিল যে পালতোলা জাহাজ সারা জগৎ ঘুরে এসে এই ঘাটে লাগত। নামত জাহাজ থেকে বোম্বেটেরা, পুজো দিত নরবলি দিয়ে ওই কালীকে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ওই কালী তখন এমন জাগ্রত ছিল যে দুনিয়ার অন্য প্রান্তের দস্যুরা পর্যন্ত একে মানত। তখন এই ঘাটে বসত হাট, মানুষ বেচা-কেনার হাট। নানা দেশ লুট করে চেনে বেঁধে জাহাজের খোলে ভরে আনত তারা মানুষ, মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ সব জাতের সব রকমের মানুষ। কচি বুড়ো পুষ্ট, যাকে কালীঘাটের ভাষায় বলা হয় পুরুষ্টু, সব জাতের মানুষ ভারি সস্তায় নিলেম হত তখন এই ঘাটে। এখনও হয়, কিন্তু রকমটা একটু বদলেছে। জাহাজের খোলে ভরে আসে না তারা কালীঘাটে, আসে ভাগ্যের পরিহাসে, সমাজের তাড়নায় কোথাও ঠাঁই না পেয়ে, পেটের জ্বালায় অন্ধ হয়ে। তারা কেউ চেনে বা দড়িতে বাঁধা থাকে না। তবু তারা থাকে, পালায় না, কালীঘাটের অদৃশ্য কালো দড়িতে বাঁধা তারা ডালা হাতে শুকনো মুখে ঘুরতে থাকে কালীঘাটে। মেয়েমানুষ-গুলো মুখে চুন কালি মেখে নিজেদের ফেরি করে বেড়ায়। আর যারা এটাও পারে না, ওটাও পারে না, তারা কালীঘাটের পথের কাদায় গড়াগড়ি খায়।

এখনও আসে পণ্য কালীঘাটের ঘাটে। শুকনো পথে আসে। আদিগঙ্গাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে যে।

ওই আদিগঙ্গা।

জলে টইটুম্বুর, দিনে দুবার জোয়ার-ভাঁটা খেলত। ওই মা, সাক্ষাৎ মা, জাগ্রত জননী। ওই গঙ্গাগর্ভে আবক্ষনিমজ্জিত সেই মহামানব, দুটি হাত জোড় করে মাথার ওপর সোজা করে তুলে আঁজলা ভরতি জল অর্ঘ্য দিচ্ছেন—

হ্রীং হং সঃ মার্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশ শক্তি সহিতায়
ইদমর্ঘ্যং শ্রীমদ্ সূর্যায় স্বাহা—

আঁজলার জল যে মুহূর্তে পড়ছে গঙ্গার জলে, সেই মুহূর্তে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। যেন আঁজলা-ভরতি ঘি ঢালা হচ্ছে যজ্ঞকুণ্ডে।

ঠিক এই সময়, এই নিশা-মহানিশার অন্তিমলগ্নে এ দৃশ্য দেখেছিল মাত্র দুটি মানুষ। ওই কংসারি হালদার একজন, আর একজন হারিয়ে গেছে। দ্বাদশ বর্ষ লুকিয়ে থাকতে হবে, শ্মশান-সাধনা করতে হবে, কায়মনোবাক্যে সত্যব্রত ধারণ করে থাকতে হবে, তবে মা জাগ্রত হবেন। একটি মাত্র সন্তানের তপস্যার ফলে আবার জগজ্জননী মুখ তুলে চাইবেন। সমস্ত জাতটা জেগে উঠবে সেই লগ্নে, মরণের ভয় আর কেউ করবে না, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ফাঁদা চলবে না তখন আর এ দেশে, আত্মপ্রবঞ্চনা করার প্রবৃত্তিই তখন ঘুচে যাবে মানুষের। কলিতীর্থ কালীঘাটের মরণজয়ী সন্তানেরা তখন বিশ্বজগৎকে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে দীক্ষা দেবে।

এই ছিল সেই মহামানবের আশা, এই তাঁর আদেশ, এই তাঁর সঙ্কেত। সে আশা, সে আদেশ, সে সঙ্কেত সার্থক করে তোলবার জন্যে একজন হারিয়ে গেল। কংসারি রইল, তার অন্য কাজ অন্য ব্রত। সে মায়ের পালাদার। তাকে মুখ টিপে মায়ের পালা চালাতে হবে, মায়ের বাড়ির ওপর নজর রাখতে হবে, আর ওই যন্ত্র রক্ষা করতে হবে। দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হলে গুরুভাই যখন সিদ্ধিলাভ করে ফিরে আসবে, তখন মায়ের বাড়ি থেকে কাজ আরম্ভ করতে হবে। সেই জন্যে হালদার রয়ে গেল। যন্ত্রটিকে হালদারের হাতে তুলে দিতে হল। পুরুষানুক্রমে এ বংশের সকলেই পূর্ণাভিষিক্ত কৌল, একমাত্র কৌলেরই অধিকার ওই যন্ত্র ছোঁবার, ওর নিত্য তর্পণ করবার। হালদারকে পূর্ণাভিষিক্ত করে সেই অধিকার দিয়ে তার হাতে যন্ত্রটি সঁপে দিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল। কুলদেবতা কুললক্ষ্মী অন্য কুলে গিয়ে আশ্রয়

নিলেন। বারোটা বছর পরেই আবার ফিরে আসবেন মা এই বংশে কিন্তু মা আর ফিরবেন না কখনও। হালদার সেই মহাযন্ত্র খুইয়েছে।

অতএব সবই যখন গেছে তখন আর ভাবনা কী!

কাজেই ধরা দেওয়া কিছুতে চলবে না। পালাতে হবে কালীঘাট ছেড়ে। কোন্ মুখে আজ তাদের সামনে গিয়ে শুধু-হাতে দাঁড়ানো যায়! ধরা পড়লেই তাদের সামনে মানুষে টেনে নিয়ে যাবে যে।

সহধর্মিণী, সহধর্মিণীর মত কাজ করলে। হাসিমুখে বিদায় দিলে। শেষ কথা কটি আজও মনে পড়ে।

"যাও তুমি, কোনও ভাবনা নেই তোমার। গুরুর আদেশে যদি বারো বছর বউ ছেলে মেয়ের মুখ দেখা বারণ হয়ে থাকে তোমার, তা হলে আমি তোমায় বাধা দেব কেন? যাও, একটুও মন খারাপ কোর না, ছেলে মেয়ে ঠিক আমি বড় করে তুলব। দেখো তুমি, ফিরে এসে দেখো, আমি কিছুতেই কালীঘাট ছাড়ব না। ছেলে মেয়ে তোমার বড় হবে, ভাল হবে। ডালাধরার ছেলে মেয়ে হয়ে ওরা বেঁচে আছে। তোমার গুরুর দয়ায় যদি তুমি সিদ্ধিলাভ করতে পার, তখন ওদের কেউ ডালাধরার ছেলে মেয়ে বলতে পারবে না। কিন্তু কথা দিয়ে যাও, যেখানেই থাক, যাই কর, বারো বছর পরে খবর দেবে আমাদের। আমি তোমার ছেলে মেয়ে তোমার হাতে তুলে দিয়ে তখন ছুটি নেব।"

আরও কত কথা বলেছিল সে। ছেলেটা তখন বছর আষ্টেকের, মেয়েটা সবে পাঁচে পড়েছে। ফ্রক পরে মায়ের বাড়িতে ছুটোছুটি করে বেড়াত। ধরে নিয়ে বসিয়ে কুমারী করাতে হত। ওই কুমারী করাবার দরুনও রাগ করত তাদের মা। মেয়ে তার খারাপ হয়ে যাবে এই ভয়ে।

সেই মেয়ে সেই ছেলে আর তাদের মা এখন কোথায়! বছর ছয়েক পরে কালীঘাটে ফিরে আর তাদের খুঁজে পাওয়া যায় নি। তেমন ভাল করে খোঁজবার চেষ্টাও করা হয় নি। কারণ বারো বছর পূর্ণ হতে অনেক বাকী যে! যদি তারা টের পেয়ে যায়, এই ভয়ে তাদের খোঁজা হয় নি ভাল করে।

সেই ভয়েই পালাতে হবে এখনই কালীঘাট ছেড়ে।

নয়তো লোকে ধরে ফেলবে, টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের সামনে খাড়া করে দেবে। তারা জানবে যে সমস্ত বিফল হয়ে গেছে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় নি। যে ডালাধরা সেই ডালাধরাই আবার ফিরে এল।

এই ন-নটা বছর কী অবস্থায় কাটিয়েছে তারা তাই বা কে জানে! যদি বেঁচেও থাকে কোনও রকমে, তবু মরে বেঁচে আছে। শুধু এই আশায় বেঁচে আছে যে, একদিন এমন এক সাধক মহাপুরুষ ফিরে আসবে তাদের কাছে, যার সাধনার মহিমায় সমস্ত দুঃখ কষ্ট গ্লানি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে আবার তারা। সে আশায় ছাই দিয়ে কোন্ মুখে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারা যায় আজ! এমন কি কুলদেবতা পর্যন্ত খুইয়ে আবাব তাদের মুখ দেখানো—কখনও নয়, কিছুতেই নয, প্রাণ গেলেও নয়।

ইট-পাটকেল দড়ি-দড়া সমস্ত বিসর্জন দিয়েছে পাগলা। কেওড়াতলার শ্মশানে খুলে ফেলে দিয়েছে সব একটা চিতার মধ্যে। ডোমেদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করেছে একখানা চাদর। মড়া চাপা দিয়ে এনেছিল কেউ, ডোমেরা তুলে নিয়েছিল। পাগলা পাগলামি করে ডোমেদের মন ভিজিয়ে আদায় করে নিয়েছে চাদরখানা। তারপর চুপি চুপি তার সাজসজ্জা সব খুলে ফেলে দিয়ে চাদরখানা জড়িয়ে পালিয়ে এসেছে শ্মশান ছেড়ে।

সেই চেনা পথ, সেই লগ্ন, গলায় গান নেই, গায়ে ঝুলছে না ইট-পাটকেল। চলেছে পাগল, শেষবারের মত চলেছে মায়ের বাড়ির দক্ষিণ দিকের ফটকে। ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত মাকে প্রণাম করে চলে যাবে।

কত দিন কত রকমের ঠাট্টা করেছে মানুষে!

"হ্যাঁ ঠাকুর, কী দেখ তুমি রোজ ও সময় মায়ের বাড়ির ফটকের ফাঁক দিয়ে?"

অম্লান বদনে জবাব দিয়েছে পাগলা, "মাকে দেখি।"

হা-হা হি-হি হেসে উঠেছে সকলে। হাসবারই কথা, রাতের তৃতীয় প্রহরে মায়ের মন্দির বন্ধ। বন্ধ না থাকলেই বা কী! অতদূর থেকে, নাটমন্দির উঠোন গেট, সেই গেটের ওধার থেকে মন্দির খোলা থাকলেও কি মাকে দেখা যায় নাকি!

"হ্যাঁ, দেখা যায়। নিশ্চয়ই দেখা যায়। তিনটি চোখ আর মুখখানি স্পষ্ট দেখা যায়। আর কিছু দেখা যায় না।"

শুনে আবার হেসে উঠেছে সকলে।

চুপি চুপি এসে দাঁড়াল পাগল গেটের বাইরে। চোখ বুজে লোহার পাটির ফাঁকে মুখখানা চেপে ধরলে। তারপর বিড়বিড় করে কী বললে। বলে চুপি চুপি আবার পালিয়ে গেল।

এইবার নকুলেশ্বরের মন্দির।

ভৈরবের মন্দির বে-আবরু। চতুর্দিকে দেওয়াল নেই। আছে লোহার গরাদে। দরজাও লোহার গরাদে দিয়ে তৈরী। তিনটি সিঁড়ি উঠে দরজা। দরজার গরাদের ফাঁকে মুখ চেপে দাঁড়াল পাগল। রাস্তার আলোয় বেশ দেখা যাচ্ছে ভৈরবকে। স্পষ্ট দর্শন হল।

মনে মনে বলতে লাগল পাগলা, "হে গুরু, হে মহাগুরু, আবার চললাম দূরে। এবার যেন সিদ্ধিলাভ হয়। এই কালীঘাট, এই মহাতীর্থ, মহামায়ার এই মহাপীঠে স্থান পাবার উপযুক্ত হয়ে যেন ফিরতে পারি।"

বহুকাল আগে শোনা একটা গানের কলি মনে পড়ে গেল পাগলের—

"পুনঃ যদি তপস্যাতে একটি ব্রাহ্মণ হতে পার
কর্মক্ষেত্রে মায়ের নামে এ জগৎ মাতাতে পার।"

গুন গুন করে গেয়ে উঠল গানের কলিটি ভৈরবের দরজায় মুখ চেপে—

"তবেই যাবে এ দুর্গতি
নইলে রে ভাই অধোগতি।"

হঠাৎ ভয়ানক রকম চমকে উঠল পাগলা।

ছুটে আসছে কে! কে যেন ছুটে আসছে ওদিক থেকে!

"মা—মা গো"—করুণ একটা টান শুনতে পেল পাগলা। সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পড়বার শব্দ হল ঠিক পেছনে।

ভৈরবের দরজা ছেড়ে তিনটে সিঁড়ি এক সঙ্গে লাফিয়ে রাস্তায় পড়ল পাগলা।

ওই তো ! ওই না কে পড়েছে রাস্তার মাঝখানে !

ছুটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তার পাশে, বসে মুখখানা উলটে ধরল ওপর দিকে। রাস্তার আলোয় মুখখানা অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগল নির্নিমেষ চোখে। তারপর দু হাতে তাকে বুকে তুলে নিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল মায়ের বাড়ির দিকে।

ঘুমিয়ে রয়েছে তখনও মায়ের বাড়ি।

ঘুম-ভাঙানো গান শোনা গেল না মায়ের বাড়ির দক্ষিণ দিকের গেটের সামনে। বহুক্ষণ কান পেতে থাকবার পর হালদার মশায় মনে মনে বলতে লাগলেন, "থাক, ঘুমিয়েই থাক মা। অনন্তকাল ঘুমোও। তোমার ওই কাল-নিদ্রা কোনও দিন আর কেউ ভাঙবার চেষ্টা করবে না।"

এল না সে, সত্যিই সে এল না। এই ধারণা মনে নিয়ে চলে গেল সে, গুরুভাই কংসারি হালদারও তাকে ঠকালে ! ফেরত দিলে না যন্ত্রটা, মিথ্যে কথা বললে যে যন্ত্রটি খোয়া গেছে !

একটি কথাও যে বুঝিয়ে বলার সুযোগ মিলল না তাকে। কংসারি হালদার তাকে ঠকায় নি, ঠকাতে পারে না তাকে কংসারি হালদার। নিশ্চয়ই ফেরত পাওয়া যাবে সেই যন্ত্র, মরবার আগে তার হাতে তার কুললক্ষ্মী সঁপে দেবেই কংসারি হালদার। কিছুতেই এর অন্যথা হবে না।

শুধু আর একটিবার একটু আলো ফুটে উঠুক হালদারের চোখে। একটু ঘোলাটে গোছের হোক অন্তত অন্ধকারটা, ফিকে গোছের একটু আলো ধরা দিক তাঁর চোখে। খুব স্পষ্ট না হোক, অন্তত একটু আবছা দেখা যেন তিনি দেখতে পান আর একটিবার। তা হলে কংসারি হালদার একবার দেখে নেবেন সেই ঠগ জোচ্চর খুনেদের। সেই চিঠি কখানি, তাদের মৃত্যুবাণ, এখনও হাতে আছে হালদার মশায়ের। যাবে কোথায় তারা !

ওই যন্ত্রটি কী জিনিস, কী করতে হয় ওটাকে নিয়ে, এ সমস্ত তত্ত্ব

বিশ্বাস করে একমাত্র তাদেরই জানিয়েছিলন হালদার মশায়। যদি তিনি নিজে কখনও অশক্ত হয়ে পড়েন, তখন ওই যন্ত্রের নিত্য তর্পণ করবে কে! এই ভয়েই তিনি ওদের দীক্ষা দিয়ে পূর্ণাভিষেক পর্যন্ত করেছেন। বারো বছর পরে কাকে ওই জিনিস ফেরত দিতে হবে তাও জানিয়েছেন। কিছুই জানাতে বাকী রাখেন নি। ভয়ানক বিশ্বাস তিনি করেছিলেন তাদের, তাই শয্যাশায়ী হয়ে যন্ত্রটি ওদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়?

হালদার মশায় বার বার নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, অন্যায়টা কোথায় তিনি করলেন?

হঠাৎ একখানি মুখ ফুটে উঠল অন্ধকারের মধ্যে। জলে টলটল করছে দুটি চক্ষু, স্পষ্ট দেখতে পেলেন হালদার মশায়। মনে হল যেন, কানেও তিনি শুনতে পেলেন ছোট্ট একটি কথা, 'এস'। যেন তিনি চিনতে পারলেন একটু ঠোঁট-টেপা হাসি। হাসিটুকু যেন তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলে— হালদার, তোমার মনের মধ্যে কী লুকিয়ে আছে, তা আমি জানি। কী কথা তুমি বলতে চাও অথচ বলতে পার না, তাও আমি জানি। দীক্ষা দেওয়া, গুরু হওয়া এ সমস্ত শুধু অছিলা তোমার হালদার, নিজেকে তুমি ঠকাতে চেয়েছিলে, সেই ঠকাবার জন্যে একটা অছিলা চাই তো। ওই ছুতোটুকু না পেলে রোজ তুমি ভোর-রাতে আসতে কী করে আমার কাছে!

না না না না, কিছুতেই তা হতে পারে না। কংসারি হালদার মায়ের সেবায়েত, কংসারি হালদার মহাসাধকের শিষ্য, কংসারি হালদারের সামনে কেউ মুখ তুলে কথা বলতে পারে না। কংসারি হালদারের গুরুভাই বনমালী চক্রবর্তী, দ্বাদশ বছর পরে সিদ্ধি লাভ হবে তার। দ্বাদশ বছরের ন বছর কেটে গেছে। এই কালীঘাটে সে আত্মগোপন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তিনটি বছর কাটলেই এমন মহাশক্তি লাভ করবে কংসারি হালদারের গুরুভাই বনমালী চক্রবর্তী যে, সেই শক্তির প্রভাবে আবার এই মহাতীর্থ জেগে উঠবে। লোভ পাপ আর ধর্মব্যবসা লোপ পাবে কালীঘাট থেকে।

হালদার মশায় লোভে পড়ে ধর্মব্যবসা করতে চেয়েছেন, এতবড় কথা কার সাধ্য বলবে বলুক তো দেখি হালদার মশায়ের মুখের সামনে ! জানে না ওরা, এখনও ভাল করে টের পায় নি, কী করতে পারেন কংসারি হালদার! সকালটা একবার হোক, আর একটিবার এই সর্বনেশে আঁধারটা ঘুচুক তাঁর চোখ থেকে। তখন তিনি দেখাবেন মজা। যেখানেই সে থাকুক, যত বড় ভুল বুঝেই সে চলে যাক, গুরুর নাম নিয়ে ডাকলে সে ফিরবেই। বিনা অপরাধে কিছুতেই সে গুরুভাইকে ত্যাগ করে জন্মের শোধ চলে যেতে পারে না।

কিন্তু যদি সে একেবারে কালীঘাট ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে ! যদি তাকে কোথাও খুঁজে না পাওয়া যায় !

হালদার মশায় তলিয়ে যেতে লাগলেন আবার নিবিড় অন্ধকারের অতল গহ্বরে। হয়তো সে গুরুর কৃপায় সবই জানতে পেরেছে, আর মনে মনে হেসে কংসারি হালদারকে ত্যাগ করে চলে গেছে চিরকালের মত। কিছুই অসম্ভব নয়।

তার মানে, আপনার বলতে আর এক প্রাণীও রইল না হালদার মশায়ের কাছে। ছেলে, ছেলের বউ, পাড়াপড়শী—এরা কে ? কেউ নয়, কোনও সম্বন্ধ নেই এদের সঙ্গে। একটি প্রাণীও জানে না কী ভাবে তাঁর আর বনমালী চক্রবর্তীর সাক্ষাৎদর্শন লাভ ঘটেছিল সেই মহাপুরুষের। এরা কি কেউ বিশ্বাস করবে, এই কালীঘাটের রাস্তায় ঘাটে গা-ময় কুষ্ঠব্যাধির ঘা বানিয়ে যারা পড়ে থাকে, ওদের মধ্যে শিবতুল্য মহাসাধকও আত্মগোপন করে থাকেন। কালীঘাটে মহানিশার অন্তে কত কী ঘটে, তার কতটুকু সংবাদ রাখে এরা ! কংসারি হালদার আর বনমালী চক্রবর্তী, মাত্র এই দুটি প্রাণী সেই দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। সারা রাত গুলির আড্ডায় কাটিয়ে বনমালী ফিরছিল ঘরে, হালদার মশায় অন্য এক নেশার টানে চলেছিলেন খালের ওপারে। মায়ের বাড়ির নহবতখানার সামনে থেকে একটা কুষ্ঠরোগীকে গড়াতে গড়াতে রাস্তাটা পার হতে দেখলেন হালদার মশায়। ঘাটে যাবার রাস্তায় ঢুকে সটান সে উঠে দাঁড়াল, দিব্যি সুস্থ সবল মানুষের মত সোজা চলতে

লাগল গঙ্গার দিকে। পেছন পেছন গা ঢাকা দিয়ে গিয়ে অন্ধকারের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুজনে দেখেছিলেন, মানুষটা গঙ্গাগর্ভে গলা পর্যন্ত জলে নেমে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আঁজলা করে গঙ্গাজল তুলে কার উদ্দেশে অর্ঘ্য দিতে লাগল। তিনবার তিন আঁজলা জল অর্ঘ্য দেওয়া হল। আর প্রত্যেকবার সেই জল গঙ্গায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

এই অবিশ্বাস্য কাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছিলেন হালদার মশায়, আর ওই বনমালী ঠাকুর। গুলিখোর ডালাধরা একটা কালীঘাটের, এর বেশী আর কোনও পরিচয় নেই ওই ঠাকুরের। কিন্তু সীমাহীন সাহস ওর, অসীম ভাগ্যের জোরও বটে। মহামানব গঙ্গা থেকে উঠতেই বনমালী তাঁর পাদপদ্মে আছড়ে পড়ল। দেখাদেখি সাহস হল হালদার মশায়েরও। তিনিও জড়িয়ে ধরলেন তাঁর দু পা। কৃপা করতেই হবে।

কৃপা তিনি করলেনও, করলেন ওই বনমালীকেই। পুরুষানুক্রমে ওরা শক্তি-সাধক, তাই ও কৃপা লাভ করলে তাঁর। কে জানত যে ওই হাড়-হাবাতে ডালাধরার ঘরে অমন অমূল্য নিধি লুকনো আছে! অন্তর্যামী গুরু প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন ওকে, "তোমার কাছে মহামায়ার যে যন্ত্রটি আছে, সেটি তুমি কার কাছে রেখে যাবে বাবা? তোমাদের ওই জাগ্রত কুলদেবতার ভার কে নেবে? তোমার ছেলে যে একেবারে শিশু।"

বনমালী কী জবাব দেবে, ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল।

তখন তিনিই দয়া করে উপায় করে দিলেন। কংসারি হালদার ভার নেবে ওই যন্ত্রের, কংসারি হালদারকে পূর্ণাভিষেক করে যেতে হবে। যতদিন না বনমালী ফেরে ততদিন কংসারি রক্ষা করবে ওই যন্ত্র। সেই কাজই হবে হালদারের সাধনা। বারো বছর বনমালীকে সংসার ত্যাগ করে থাকতে হবে। বারো বছর পরে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে ফিরবে বনমালী, কংসারির কাছেই ফিরে আসবে। তখন কালীঘাট আবার জাগবে। মহাতীর্থের মহামহিমা তখন বিশ্বজগৎকে শান্তির পথ দেখাবে।

কালীঘাটের সমস্ত কলুষ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। একটি মাত্র শক্তি-সাধকের সাধনার ফলে মা আবার জেগে উঠবেন।

মস্তবড় আশা। হালদার মশায় যন্ত্রটির ভার নিলেন। বনমালীর সংসারের ভারও তিনি নিতে চেয়েছিলেন। বনমালী রাজী হল না। প্রতিজ্ঞা করিয়ে গেল হালদার মশায়কে, তিনি কিছুতেই তার ছেলে মেয়ে স্ত্রীর খোঁজ খবর নিতে পারবেন না। গুরুর কৃপায় যদি তারা বাঁচে তো বাঁচবে। নয় তো তাদের বেঁচে দরকার নেই।

ছ বছর পরে বনমালী ফিরে এসে শ্মশানে আশ্রয় নিলে। শেষ ছ বছর শ্মশানবাস করতে হবে তাকে গুরুর আদেশে। এই কালীঘাটেই থাকতে হবে আত্মগোপন করে। শেষ ছ বছরের আর তিনটি বছর বাকী।

সেই বনমালী এই ধারণা নিয়ে গেছে, গুরুভাই কংসারি হালদার তাকে ঠকিয়েছে, যন্ত্রটা ফেরত দিলে না। উঃ—

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলেন হালদার মশায়। আলো, আলো কই? একটু ফিকে গোছের আলো, আবছা গোছের অন্ধকার, অন্তত সামান্য একটু ফুটো নিরেট নিরন্ধ্র নিকষ কালো পর্দাখানার গায়ে। কিছুই কি নেই, কোনওখানে কোথাও একটু ফাঁক নেই, যার ভেতর দিয়ে হালদার মশায় একটিবার একটু উঁকি দিতে পারেন।

হালদার মশায়ের প্রাণটা আনচান করতে লাগল। বালিশের ওপর অনবরত তিনি মাথা চালতে লাগলেন, অবুঝ শিশুর মত অস্থির হয়ে উঠলেন একেবারে।

ধনা পৌঁছল মায়ের বাড়ির পুবে কুণ্ডের কিনারায়। এবার সে ফিরবে, আর সে এগতে পারে না। পাথরখানা না নিয়ে কোন্ মুখে সে দাঁড়াবে গিয়ে হালদার মশায়ের সামনে! কী জবাবই বা দেবে তাঁকে!

ফিরে দাঁড়াল ধনা। বললে, "এবার আপনি যান। সিধে চলে যান, গিয়ে বাঁ-হাতী গলিতে ঢুকুন। ওই গলি দিয়ে গেলেই—"

বাধা দিয়ে তিনি বললেন, "তুমি যাবে না বাবা?"

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল ধনা। কী উত্তর দেবে সে! ফিনকিকে খুঁজে না পেলে কী করে সে ফিরিয়ে দেবে সেই পাথরখানা!

হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "কে—কে ওখানে?"

চমকে উঠে ধনা জিজ্ঞাসা করলে, "কই? কাকে দেখলেন?"

"ওই যে কুণ্ডের জল থেকে উঠে আসছে।"

এইবার ধনা দেখতে পেল। দেখল একজন উঠে আসছে কুণ্ডের ভেতর থেকে, স্পষ্ট দেখতে পেল লোকটার দু হাতের ওপর আর একটা মানুষ। বুকের কাছে ধরে বয়ে আনছে কাকে ও!

এ কী! কাউকে ডুবিয়ে মারতে এসেছে নাকি কেউ মায়ের কুণ্ডে?

চেঁচিয়ে উঠল ধনা, "কে—কে তুমি? তুম কৌন্ হ্যায়?"

জবাব নেই। লোকটা পালাবার জন্যে জোরে পা চালালে। এক লাফে তার সামনে পড়ে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল ধনা, "চোর! চোর!"

তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে ঘুমন্ত কালীঘাট রৈ-রৈ করে উঠল। দোকান-পাট ঘর-বাড়ির ভেতর থেকেই মানুষে চেঁচাতে লাগল, "চোর চোর, ধর্ ধর্, মার্ মার্।" ধড়াধ্বড় আওয়াজ উঠল জানলা দরজা খোলার। চতুর্দিক থেকে দুপদাপ শব্দে ছুটে আসতে লাগল সকলে। ভিখিরীগুলো তাদের ফুটপাথ-শয্যার ওপর উঠে বসে হাউ-মাউ-খাউ জুড়ে দিলে। মায়ের মন্দিরের চুড়োর ওপর কালীঘাটের শান্ত স্নিগ্ধ উষা তেতে আগুন হয়ে উঠল।

যে পালাচ্ছিল সে ধপ করে বসে পড়ল ধনার পায়ের কাছে। যাকে সে বয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল তাকে কিন্তু ছাড়লে না। ছু হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে রইল নিজের বুকের সঙ্গে। কিছুতেই যেন কেউ কেড়ে নিতে না পারে তার বুকের ধন, এ জন্যে মাথা নিচু করে আড়াল দিয়ে রইল। ধনা যাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল হালদার-বাড়িতে তিনিও এক অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। ছুটে এসে ছু হাত মেলে আগলে দাঁড়ালেন তাদের। পাছে লোকে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এই ভয়েই বোধ হয় আড়াল করে দাঁড়ালেন।

রাস্তার আলো নিভে গেছে তখন, আকাশের আলোয় ভাল করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবু ধনা দেখতে পেলে মুখের পাশটা, লোকটার কাঁধের ওপরে পড়ে আছে মুখখানি। দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ধনা, ছু হাতে ধরে ফেললে হাত ছুখানি। প্রাণপণে আবার চেঁচিয়ে উঠল, "ফিনকি, ফিনকি!"

ততক্ষণে বহু মানুষ জমে গেছে চারিদিকে। ভাল করে ঘুমের ঘোরও বোধ হয় কাটে নি কারও। কী যে ঘটছে চোখের সামনে, তার মাথামুণ্ডু বুঝতেই পারলে না কেউ। একটা মানুষ একটা মেয়েকে ছু হাতে আঁকড়ে ধরে বসে আছে পথের মাঝখানে, আর একটা ছোঁড়া মেয়েটার হাত ছুখানা ধরে মরিয়া হয়ে টানাটানি করছে। মেয়েটা মরেছে কি বেঁচে আছে তাও বোঝার উপায় নেই।

চিৎকারের চোটে আকাশ বাতাস ফেটে যাবার যোগাড়। যার যা মুখে আসছে তাই বলে চেঁচাচ্ছে। আরও মানুষ ছুটে আসছে চারিদিক থেকে। যে যা হাতের কাছে পেয়েছে নিয়ে এসেছে। কিন্তু হাতের সুখ করার উপায় নেই কারও। সামনে ধনা, পেছনে তিনি, লোকে চোরটার কাছে পোঁছতেই পারছে না। কাজেই শুধু ঠেলাঠেলি আর গুঁতোগুঁতি। কেউ কারও কথা শুনতেও পাচ্ছে না, শোনার দরকারও নেই। চোর যখন ধরা পড়েছে তখন আর কী! যে যত পার মনের সুখে গলা ফাটিয়ে চেঁচাও।

ইতিমধ্যে কোন ডেঁপো দমকল ডেকে ফেলেছে। দূরে

কালী-টেম্পল রোডের মোড়ে শোনা যাচ্ছে ঢং ঢং ঢং ঢং আওয়াজ। প্রাণ-কাঁপানো আওয়াজ তুলে ছুটে আসছে দমকল। দমকল পৌঁছবার আগেই পৌঁছে গেল পুলিসের তুখানা লরি। লাঠি হাতে লাফিয়ে পড়ল লরি তুটো থেকে তু-তিন কুড়ি লালপাগড়ী। সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেল তুখানা দমকল। ঢং ঢং ঢং ঢং প্রচণ্ড শব্দে সব রকমের চিৎকার গোল-মাল ডুবে গেল।

কে কাকে থামাতে পারে! হকচকিয়ে গেছে সকলে। আগুন লাগল আবার কোথায়!

দমকলওয়ালারা বাজিয়েই চলেছে ঘণ্টা পথ সাফ করার জন্যে। পুলিস ভাবলে, নিশ্চয়ই লেগেছে আগুন ওধারে, ওই খালের পারে কোথাও, নয়তো দমকল এল কেন? সুতরাং সর্বাগ্রে পথ করে দাও দমকলের জন্যে, হটাও মানুষ, ভিড় হটাও।

আরম্ভ হয়ে গেল পুলিসের আদি ও অকৃত্রিম হাতের খেলা। লাঠি আর লালপাগড়ী চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষের ওপর। চক্ষের নিমেষে সাফ হয়ে গেল ভিড়। বাড়ি-ঘর মানুষের বুক সব কাঁপাতে কাঁপাতে দমকল তুখানা ছুটে চলে গেল পশ্চিম দিকে।

সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডর মধ্যে হুঁশ ফিরে পেলে ফিনকি। মাথাটা তুললে সে, তারপর লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে চোখ মেললে। চোখ মেলেই সে বুঝতে পারলে যে তার হাত তুখানায় ভয়ানক টান পড়ছে। পর-মুহূর্তেই তার মনে হল যে, কে যেন তাকে জড়িয়ে ধরে আছে। এতটুকু নড়বারও তার শক্তি নেই।

আর যাবে কোথা, চিল-চেঁচানি জুড়ে দিলে ফিনকি চোখ বুজে। হঠাৎ সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মেয়েটা বেঁচে আছে তা হলে! চেঁচানির চোটেই বোধ হয় যে তাকে আঁকড়ে ধরে ছিল তার হাতের বাঁধন গেল আলগা হয়ে, কিন্তু কবজির বাঁধন আলগা হল না। ফলে এক হেঁচকায় ফিনকি পৌঁছে গেল ধনার বুকের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কবজি ছেড়ে দিয়ে তু হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলে ধনা। সেই মুহূর্তে একটিবার মুখ তুলে চোখ চেয়ে দেখতে পেলে ফিনকি ধনার মুখখানা। দেখেই ফিনকিও

তাকে দু হাতে আঁকড়ে ধরলে। চেঁচানি কিন্তু সে থামালে না। ধনার বুকে মুখ গুঁজে পরিত্রাহি চেঁচিয়েই যেতে লাগল।

চারিদিকে তখন পুলিস। অত জোড়া চোখের সামনে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে আছে। ধনার দু চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে। গলা ফাটিয়ে সে বলেই চলেছে এক কথা, "চোর, চোর—একে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল ওই লোকটা।"

ওদের দুজনের পায়ের কাছে একমাথা চুল, একমুখ বিশ্রী গোঁফ-দাড়ি, সর্বাঙ্গে ময়লা-মাখা সেই লোকটা মাথা নিচু করে বসেই রইল। কিছুতেই সে আর মাথা তুলতে পারে না।

একজন অফিসার পুলিসের ব্যূহ ভেদ করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পিছনে এলেন পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা চতুরানন চৌধুরী। হাকিম সাহেব ফিনকির দিকে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই যে, এই যে সেই মেয়ে।" টপ করে একবার মুখ তুলে হাকিমের মুখের দিকে তাকিয়েই ফিনকি আবার মুখটা গুঁজে ফেললে ধনার বুকে। যেন সে কোনও রকমে ধনার বুকের ভেতর লুকতে পারলে বাঁচে।

অন্য কেউ কিছু বলবার আগেই যিনি আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ চোরটাকে, তিনি এক পা এগিয়ে এসে ধরে ফেললেন ফিনকির কাঁধটা। মিনতি করে বললেন ধনাকে, "ছেড়ে দাও বাবা এবার। এস তো মা আমার কাছে।"

ধনা ছেড়ে দিলে তৎক্ষণাৎ, ফিনকিকে তিনি টেনে নিলেন নিজের বুকে। নিয়ে তাঁর গায়ের চাদর দিয়ে ঢেকে ফেললেন তাকে।

ব্যাপার দেখে চতুরানন চৌধুরী ঘাড় চুলকতে লাগলেন। অফিসার চড়া সুরে হুকুম দিলেন, "এই, উঠাও ইস্‌কো।"

তৎক্ষণাৎ আরও কঠিন স্বরে আদেশ হল, "খবরদার, কেউ ওঁর গায়ে হাত দেবেন না।" যিনি ফিনকিকে চাদর ঢাকা দিয়েছিলেন তাঁর দিকে সকলের নজর গিয়ে পড়ল। তিনি তখন অনুনয় করে বলছেন, "উঠুন এবার আপনি, দয়া করে উঠে দাঁড়ান।" কারও মুখে একটি

কথা নেই। লোকটা মাটিতে হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। ধনার মাথায় এক-খানা হাত রেখে অতি আশ্চর্য রকম শান্ত গলায় সে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কে বাবা? তোমায় তো চিনতে পারছি না। এ মেয়ে তোমার কে?"

কী উত্তর দেবে ধনা! ভয়ানক ভ্যাবাচাকা খেয়ে সে তাকাতে লাগল চারিদিকে। বোধ হয় আবার সটকাবার মতলবই এসে গেল তার মাথায়।

কিন্তু অত মানুষের মাঝখান থেকে সটকাবে কী করে সে! তা ছাড়া ফিনকিকে ফেলে সটকানো, তাই বা কী করে সম্ভব! যা ভয়ানক মেয়ে, আবার হয়তো গা-ঢাকা দিয়ে বসবে।

ধনা তোতলাতে শুরু করলে।

"মানে—ও হল—এই মানে—"

হাকিম চতুরানন চৌধুরী চড়া সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ও তোমার কে হয়?" আরও ঘাবড়ে গেল ধনা, তোতলানোও বন্ধ হয়ে গেল তার। করুণ চোখে সে তাকাল একবার ফিনকির দিকে। সেই মুহূর্তে ফিনকিও একবার মুখ তুলে তাকাল ধনার চোখের দিকে। সে চাউনিতে কী ছিল ধনাই জানে। মরিয়া হয়ে সে বলে বসল, "ও হল, এই যাকে বলে, পরিবার—আমার পরিবার।"

হো-হো শব্দে হেসে উঠল সকলে। দাড়ি-গোঁফ-সুদ্ধ সেই বিশ্রী লোকটাও হাসতে লাগল প্রাণখোলা হাসি। পুলিস অফিসারের তো আর বেশীক্ষণ হাসা চলে না। তিনি লাগালেন এক প্রচণ্ড ধমক পাগলাটাকে।

"এই, হাসছ যে? হাসছ কেন দাঁত বার করে? তুমি কে? পেলে কোথায় এই মেয়েটাকে?"

"আমি কে?" পাগলা আবার জুড়ে দিলে হাসি। হাসতে হাসতে বলতে লাগল, "আমি কে? তা তো জানি না বাবা। তা জানে কংসারি হালদার। হালদার বলে দেবে, কে আমি। চল, নিয়ে চল আমাদের

হালদারের কাছে। ওই মেয়েটাকে আর বাবাজীকেও নিয়ে চল হালদারের কাছে, সে বলে দেবে, ওরা আমার কে হয়।"

চতুরানন তখন যেন আন্দাজ করতে পেরেছেন খানিকটা। হালদার মশায়ের নাম শুনে বেশ একটু নরমও হয়ে পড়লেন তিনি। বললেন, "হালদার মশায় চেনেন আপনাকে? বেশ, তা হলে চলুন, তাঁর কাছেই যাওয়া যাক।"

হালদার মশায় শান্ত হয়েছেন, বন্ধ হয়েছে তাঁর ছটফটানি। চোখ বুজে স্থির হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। চোখ মেলবার প্রয়োজনই তাঁর ফুরিয়ে গেছে। মেলাই থাকুক বা বোজাই থাকুক, সবই এখন এক কথা। দিনই হোক বা রাতই হোক, কিছুতেই কিছু আর যায়-আসে না হালদার মশায়ের। অন্ধের কিবা রাত কিবা দিন—দুইই সমান।

বহুক্ষণ ঝড়-ঝাপটা খাওয়ার পর একটা আশ্রয় পেলে কাক যেমন ভাবে ঠোঁট ফাঁক করে মুখ ওপর দিকে তুলে চুপ করে বসে থাকে, তেমনি দশা হয়েছে হালদার মশায়ের। বহুক্ষণ তিনি যুঝেছেন ঝড়-ঝাপটার সঙ্গে, আশা নিরাশার প্রচণ্ড দুলুনিতে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল তাঁর। আলো-আঁধারের নির্মম নিষ্পেষণে তাঁর প্রত্যেকটি বুকের পাঁজরা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে বোধ হয়। এতক্ষণে মিলেছে পরিত্রাণ, এতটুকু আর সন্দেহের অবকাশ নেই। চরম জানাটা জেনে ফেলেছেন হালদার মশায়। জেনেছেন, অন্ধকার—শুধু অন্ধকার। বিরামহীন অনন্ত অন্ধকার মাত্র সম্বল এখন। কোথাও কোনওখানে এক বিন্দু আলোর চিহ্নমাত্র নেই।

কাঁদছে সকলে। তপু তারু বউমায়েরা সবাই নিঃশব্দে কাঁদছে তাঁর চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে। ওদের নিঃশব্দ কান্নার শব্দও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন হালদার মশায়। স্থির হয়ে শুয়ে তিনি শুনছেন ওদের নীরব কান্না। কান্নাই শুধু শুনছেন, শুধু কান্না ছাড়া আর কোনও কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না তিনি।

ডেকে পাঠানো হয়েছে পঞ্চানন ভটচাযকে, বড় মিশ্র মশায়কেও ডাকতে পাঠানো হয়েছে। তারা আসছে, কংসারি হালদার ডাকছেন শুনলে তারা আসবেই। এলে পর হালদার মশায় সব কথা খুলে বলবেন সকলের সামনে। এতটুকু কিছু রেখে-ঢেকে বলবেন না। তখন সকলে জানতে পারবে কংসারি হালদারের আসল রূপটা। সারা

কালীঘাটের মানুষ কখনও মুখ তুলে কথা কইতে পারে নি তাঁর সামনে। যমের মত ভয় করেছে সকলে তাঁকে। এতকাল সকলে জেনেছে, এতটুকু অন্যায্য অন্যায়, তিলমাত্র ছ্যাঁচড়ামি ভণ্ডামি, বিশেষত ধর্মের নামে ব্যবসাদারি কংসারি হালদার মশায়ের সামনে চলবে না। সবাই জানে, মায়ের বাড়ি থেকে বহু পাপ দূর হয়েছে কংসারি হালদারের জন্যে। এই একটি মানুষের সদা-সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না বলে মায়ের বাড়ির মধ্যে টানা-হেঁচড়ান, জোর-জুলুম করা বা মেয়েমানুষের গা ছোঁয়ার কোনও উপায় ছিল না কারও। নেশা করে মায়ের বাড়িতে কেউ ঢুকেছে টের পেলে হালদার মশায় তাকে পুকুরে চোবাবার ব্যবস্থা করতেন। অত্যাচার, নির্দয় হয়ে শুধু অত্যাচারই চালিয়ে গেছেন জীবনভোর কংসারি হালদার, কালীঘাটের মায়ের বাড়ি চেটে যারা কোনও রকমে বেঁচে আছে তাদের ওপর। মুখ বুজে সকলে সহ্যও করেছে তাঁর অত্যাচার। এবার তারা প্রতিশোধ নেবে। এতকাল পরে সকলে জানবে, কংসারি হালদারের চেয়ে পাপী আর একটিও নেই কালীঘাটে। টাকার জন্যে লোকটা যা করেছে তা করার সাহস আর একটি প্রাণীরও নেই কালীঘাটের ত্রিসীমানার মধ্যে।

তখন আর এরা কাঁদবে না। তপু তারু বউমায়েরা আর চোখের জল ফেলবে না তখন। তখন ওরা ওদের মুখ লুকবে কোথায় তাই ভেবে পাবে না।

তারপর কান্না, শুধু কান্না, নিরবচ্ছিন্ন কান্নাই শুধু শুনবেন হালদার মশায়। কান্নাটা শুনতে পাবেন তাঁর বুকের ভিতর থেকে। কান্নার সমুদ্র ফুঁসিয়ে উঠবে তাঁর বুকের মধ্যে। কিছুতেই সেই কান্নার ঢেউ থামানো যাবে না।

প্রাণপণে নিজেকে নিজে সামলে রাখলেন হালদার .মশায়। আঃ, এই সঙ্গে যদি শোনার ক্ষমতাটুকুও লোপ পেত! যদি কেউ দয়া করে তাঁর কান দুটো কোনও রকমে বুজিয়ে বন্ধ করে দিত!

তা হলে অন্তত তিনি কান্না শোনার দায় থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচতেন।

হালদার মশায় ডুব দেবার চেষ্টা করলেন নিজের মধ্যে। ডুবে তিনি এড়িয়ে যেতে চান কান্না, কান্নাকে তিনি ফাঁকি দিতে চান নিজের মধ্যে নিজে তলিয়ে গিয়ে।

অসম্ভব, আরও অসম্ভব। কান্না তখন নিবিড় কালোরূপ ধরে তাঁর অন্ধ চোখের অন্ধদৃষ্টি জুড়ে দাঁড়িয়ে অট্টহাসি হাসতে লাগল।

সভয়ে বোজা চোখ আরও জোরে বুজে রইলেন হালদার মশায়। জোরে, আরও জোরে, অন্তিম চেষ্টায় তিনি তাঁর অন্ধ চোখের দৃষ্টি-শক্তিটুকুকে পিষে মারতে চাইলেন।

উপায় নেই, কোনও উপায় নেই। যতই তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন কিছু না দেখবার জন্যে, ততই সেই কালো রূপ স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট, একেবারে জাজ্বল্যমান স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল তাঁর বুকের মধ্যে। চেয়ে রইলেন হালদার মশায় সেই নিবিড় কালো কান্নার দিকে। অসহায় ভাবে চেয়েই রইলেন।

চেয়ে থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত যা চাইছিলেন তিনি, তাই পেলেন। শোনার দায় থেকেও অব্যাহতি পেলেন। দেখাবও কিছু নেই, শোনারও কিছু নেই, একদম কোথাও কিচ্ছু নেই। শুধু আছে একটা অনুভূতি, যেমন শীত বা গ্রীষ্ম। দেখাও যায় না, শোনাও যায় না, কিন্তু বোঝা যায় যে শীত করছে বা গরম হচ্ছে। তেমনি হালদার মশায় বুঝতে পারলেন যে কান্না রয়েছে। কালো কান্না, নীরব কান্না, রূপহীন বর্ণহীন বোবা কান্না। যা শোনাও যায় না, বোঝাও যায় না, শুধু মর্মে মর্মে অনুভব করা যায়।

সে কান্নায় শোক নেই, দুঃখ নেই, হা-হুতাশ নেই, জ্বালা-যন্ত্রণাও নেই। সে কান্নায় প্রাণ নেই, মন নেই, হৃদয় নেই, রাগ-হিংসাও নেই। সে কান্নায় কারও করুণা উদ্রেক করবে না, কারও মন টলবে না, কারও হৃদয় গলবে না। হালদার মশায় পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেই নির্দ্বন্দ্ব কান্নার মাঝে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। তাঁর বুকের জ্বালা জুড়িয়ে গেল সেই কালো কান্নার সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে। বহুকাল পরে তিনি নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে কারও হাতে সঁপে দিতে পেরে শান্তি পেলেন।

একেবারে ভাবনাচিন্তাশূন্য হয়ে গেল তাঁর মন, বুকের বোঝা নিঃশেষ হয়ে নেমে গেল। একদম নিঃসঙ্গ হওয়ায় যে এত সোয়াস্তি, তা তিনি কখনও জানতে পারেন নি জীবনে। নিঃসঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কতখানি যে নিঃশঙ্ক হওয়া যায় তা টের পেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

কতক্ষণ যে এ অবস্থায় কাটল তাঁর তা তিনি টের পেলেন না, সময়টাও যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। হালদার মশায়ের মনে হল যে চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও কোথায় মিলিয়ে গেছে, এমন কি তিনি নিজেও নেই। আছে শুধু নিবিড় নিঃসঙ্গ অন্ধকার। অন্ধকারও তাকে বলা ভুল, বলা উচিত শুধু কালোই আছে, কালোর অন্তরের মধ্যে যে কালো থাকে, সেই অনাবিল কালো ছাড়া কোথাও আর কিছু নেই।

তারপর এক সময় সেই কালো কান্নার বুকে ধ্বনি ফুটে উঠল—

"আমি তাই কালো রূপ ভালবাসি"

খুব ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পণে আবার চেতনার রাজ্যে ফিরে আসতে লাগলেন হালদার মশায়। একটু একটু করে বুঝতে লাগলেন শব্দগুলো—

"আমি তাই কালো রূপ ভালবাসি।
জগ-মনোমোহিনী এলোকেশী—
ভালবাসি॥"

ভুল শুনছেন না তো!

হালদার মশায়ের মনে হল, শোনাটা তাঁর মনের ভুল। গাইছে না কেউ ও গান। কে গাইবে এই নিবিড় কালো অন্ধকারের মাঝে! তবু তিনি শুনতে লাগলেন প্রাণ-মন দিয়ে—

"আমি তাই কালো রূপ ভালবাসি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব—
কালো রূপ তার হৃদয়বাসী,
কালো বরণ—"

এ কী! কালো কান্নার বুকে ভাষা ফুটল নাকি!

হালদার মশায়ের মনে হল, কান্নার ভাষাটা যেন এবার একটু একটু তিনি বুঝতে পারছেন।

"যিনি দেবের দেব মহাদেব
কালো রূপ তার হৃদয়বাসী
কালো বরণ
ব্রজের জীবন
ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী—
ভালবাসি।
আমি তাই কালো রূপ ভালবাসি॥"

গলাটাও চিনতে পারছেন যেন হালদার মশায়। না না, তা হতেই পারে না। কিছুতেই তা হতে পারে না। কোথা থেকে আসবে সে এখানে? কেন সে আসবে? সবই তো সে বুঝতে পেরেছে, কিছুই তো লুকনো যায় নি তার কাছে। সে জেনে গেছে কংসারি হালদারের ভেতরে কালো ছাড়া অন্য কিচ্ছু নেই। কংসারি তাকে ঠকিয়েছে। তাই সে চলে গেছে চিরকালের মত কংসারিকে ছেড়ে। সে আসবে কোথা থেকে এখানে এই অন্ধকার কান্নার মধ্যে মরতে?

তবু শুনতে লাগলেন হালদার মশায়—

"হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী
বাঁশী ত্যজে করে অসি,
প্রসাদ ভনে
অভেদ জ্ঞানে
কালো রূপের মেশামেশি—
ভালবাসি।
আমি তাই কালোরূপ ভালবাসি।

শ্যামা মনোমোহিনী এলোকেশী—
ভালবাসি ॥”

গান শেষ হবার আগেই চোখ মেললেন হালদার মশায়।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠলেন।

এ কী! আলো যে! আলো, আলো, আলো—আবার আলো যে রে! আলো যে!

আলোর মাঝে ফুটে রয়েছে দাড়ি-গোঁফ-সুদ্ধ মুখ একটা, বনমালীর মুখ। বনমালী তাঁর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে গাইছে—

“হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী”

হালদার মশায় মাথা ঘুরিয়ে একে একে সকলের মুখের দিকে তাকালেন। সকলেই এসেছে আবার, আসতে বাকী নেই আর কেউ। ভটচায এসে দাঁড়িয়েছে শিয়রে, একমনে জপ করে চলেছে ইষ্টমন্ত্র। বড় মিশ্র মশাই দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে তারকব্রহ্ম নাম আওড়াচ্ছেন। ছেলেরা বউমায়েরা রয়েছে পায়ের দিকে, ওরা কাঁদছে। ওদের চোখে সত্যিই জল। আরে, নাতি-নাতনীগুলোও এসেছে যে! ওরা যে সাহস করে ঢুকল তাঁর ঘরে! কাঁদছে না কেউ, মহা-অপরাধীর মত মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আর ওটা কে! সেই ফিনকিটা নয়! আর ওর ওধারে ও কে! হালদার মশায় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ফিনকির দিকে। ফিনকিকে সামনে নিয়ে যিনি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন হালদার মশায়। চোখ আর ফেরাতে পারলেন না।

বনমালী ঠাকুর ফিসফিস করে বলতে লাগল, “কী দেখে এলে হালদার? এতক্ষণ ধরে চোখ বুজে কী দেখলে তুমি? কালো ছাড়া আর কিছু দেখতে পেয়েছ কোথাও? বল হালদার, বল, কী দেখে এলে তুমি?”

অতি কষ্টে একখানি হাত উঠিয়ে বনমালীর গায়ের ওপর রাখলেন হালদার মশায়। অতি কষ্টে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, "না বনমালী, কালো ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।"

নিস্তব্ধ ঘরে আর কারও মুখে কোনও কথা নেই, শুধু অস্পষ্ট শোনা যেতে লাগল বড় মিশ্র মশায়ের মুখে তারকব্রহ্ম নাম।

শেষে চতুরানন চৌধুরী এগিয়ে গেলেন। দু পা সামনে এসে হালদার মশায়ের নজরে পড়লেন তিনি। তাঁর চোখের সঙ্গে হালদার মশায়ের চোখ মিলতেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছেন কাকা? একটু ভাল বোধ করছেন তো?"

"কে! চতুর, তুমি এত সকালে—!" হালদার মশায় বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

"আপনাকে দেখতে এলাম কাকা। আমি জানতাম না যে আপনার এত বড় অসুখ। এই এঁরা সকলে আসছিলেন আপনার কাছে, আমিও সঙ্গে এলাম।" চতুরানন চৌধুরী আর কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

বনমালী ঠাকুর তৎক্ষণাৎ শুধরে দিলে কথাটা।

"না না হালদার, শুধু তোমায় দেখতেই আসেন নি ইনি। এসেছেন আমার পরিচয়টা জানার জন্যে। আমি পালাচ্ছিলাম মেয়ে চুরি করে, হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছি।"

হালদার মশায় আরও আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

"মেয়ে চুরি! কার মেয়ে?"

"ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে ওধারে। ওই যে।"

বনমালী ঠাকুর ফিনকিকে দেখিয়ে দিলেন।

"ও মেয়ে তো তোমার! ওকে চুরি করলে কোথা থেকে? ধরলেই বা তোমায় কে?"

"ধরলেন ওই উনি, ওই যে এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাবাজী। উনি ধরলেন, ধরে সকলের মুখের ওপর বলে ফেললেন যে ওঁর পরিবারকে চুরি করে নিয়ে আমি পালাচ্ছিলাম। তাই এঁরা জানতে এসেছেন আমার পরিচয়।"

কিছুই না বুঝতে পেরে হালদার মশায় ধনাকেই ডাকলেন কাছে, "এ ধারে আয় তো বাবা, বল্ তো কী হয়েছে ? ওই মেয়েটার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছে নাকি ?"

ধনা সামনে এসে দাঁড়িয়ে ঘাড় চুলকতে লাগল। মুখ সে তুলতেই পারলে না, কাজেই জবাব দেবে কী করে !

তখন ফিনকিকে ধরে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, "ওই ছেলে আমাকে নিয়ে আসছিল এখানে। মায়ের কুণ্ডের ধারে আমরা দেখতে পেলাম, এই মেয়েটাকে কাঁধে করে উনি উঠে আসছেন কুণ্ড থেকে। মেয়েটার তখন হুঁশ নেই।"

চতুরানন বলে উঠলেন, "সেই তো হচ্ছে কথা। মেয়েটাকে আনলে কে আমার বাড়ি থেকে ? রাত বারোটা একটা পর্যন্ত জ্বরে বেহুঁশ ছিল ও, রাত একটার পর আমি শুতে গেছি। জ্বরটা তখন কমে আসছিল। একটা ঝি ছিল ওর কাছে। ঝিটা ভোরবেলা চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। উঠে দেখি, মেয়ে নেই। তখনই থানায় জানালাম, তারপর কুণ্ডের ধারে গোলমাল হচ্ছে শুনে এসে দেখি, ইনি ধরা পড়েছেন ওই মেয়ে নিয়ে।"

ধনা এতক্ষণে কথা বলার ফাঁক পেলে। তোতলাতে তোতলাতে বললে, "মানে—আমি এই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম কিনা ওকে। ও যে পালিয়েছিল ওদের বাড়ি থেকে। আর আপনার সেই পাথরখানা আমি রাখতে দিয়েছিলাম কিনা ওর কাছে, তাই—"

হালদার মশায় খপ করে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন ধনাকে। ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় সেই পাথরখানা ? দে তো বাবা, দে তো আমায় সেটা। সে পাথর যার জিনিস তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই আমি।"

ধনা তৎক্ষণাৎ দেখিয়ে দিলে ফিনকিকে।

"ওই ওর কাছে জমা দিয়েছি হালদার মশায়। মানে, মনে করেছিলুম, এক ফাঁকে সেটা নিয়ে গিয়ে খালের ওপারে দিয়ে আসব। তা ও যে সটকাবে বাড়ি থেকে তা তো—"

ফিনকি ঝাঁ করে মুখ তুলে বলে ফেললে, "হাড়-মিথ্যুক কোথাকার! কিচ্ছু বলে নি ও আমাকে হালদার মশায়। টপ করে পাথরখানা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে সরে পড়ল।"

হাসির ধুম পড়ে গেল ঘরের ভেতর। একটু আগে যেখানে শোকের গুমটে সকলের দম বন্ধ হওয়ার যোগাড় হয়েছিল, সেখানে শান্তির শীতল হাওয়ায় সবাই নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। স্বয়ং হালদার মশায়ও হেসে ফেললেন।

ঘরের বাইরে আবার গোলমাল শোনা গেল। কে যেন বলছে, "হাঁ, এই ঘরেই আছে সে মেয়ে। যে চুরি করেছিল মেয়েটাকে সেও ধরা পড়েছে।"

আর একজন হেঁড়ে গলায় বলতে লাগল, "আরে বাব্বা, মেয়ে নিয়ে পালাবে কোথায় বাছাধন? আমার নাম পরানকেষ্ট গুঁই, আমার লোকের গায়ে হাত দেওয়া, আমার লোককে বেইজ্জত করা—দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজাটা!"

হুড়মুড় করে অনেক লোক ঢুকে পড়ল ঘরে। ফিনকির মা ছুটে এসে দু হাতে জাপটে ধরলেন মেয়েকে। বুক-ফাটা একটা আর্তনাদ শোনা গেল, "ফিনকি রে, কী করে তুই তোর মাকে ছেড়ে পালিয়ে এলি?"

ফনাও দৌড়ে এসে ধরে ফেললে বোনের হাত একখানা। একটি কথাও কইতে পারলে না সে। সবাই দেখলে, বোনের হাত-ধরা হাত-খানা তার ঠকঠক করে কাঁপছে।

আড়তদার পরানকেষ্ট কাজের মানুষ। তিনি কাজের কথাই বলতে লাগলেন বার বার, "দারোগা সাহেব কই? গেলেন কোথা জমাদার সাহেব? সাবধান, চোরটা যেন না পালায়। হাতে-নাতে ধরা পড়েছে বাছাধন, কিছুতেই ছাড়া হবে না। এ শালা হাড়-নচ্ছারের স্থান কালীঘাট। মান-ইজ্জত নিয়ে ঘর করতে পারে না কেউ এখানে। এবারে দেখাচ্ছি মজা, আমার নাম পরানকেষ্ট গুঁই, আমার সঙ্গে—"

হঠাৎ ধনা খেপে গেল একেবারে। এক লাফে ফিনকির কাছে

গিয়ে সে তার আর একখানা হাত ধরে ফেললে। নিছক অপরাধীর আকুল আকুতি ফুটে উঠল তার গলায়।

"এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি গালছি, মাইরি, আর ছোট কাজ করব না কখনও। পাথরখানা ফেরত দিয়ে দাও, নয়তো হালদার মশায় আমায় মেরে ফেলবে।"

ফিনকিও গেল খেপে। এক ধমক লাগিয়ে দিলে সে, "চুপ, চোর কোথাকার! কিসের জন্যে মরতে দিতে গেলে আমার হাতে পাথরখানা?"

আবার হেসে উঠল অনেকে। তাতে ফিনকি আরও রেগে গেল। সে ভাবলে, তাকেও সকলে ধনার মত চোর মনে করছে। চিৎকার করে উঠল সে, "কেন আমায় সকলে চোর মনে করবে তোমার জন্যে? কেন—?"

রাগের চোটে ফিনকির বাক্-রোধ হয়ে গেল। আর কিছুই বলতে পারলে না সে, তার দুই চোখ থেকে আগুন ছুটছে তখন। হাতখানা কিন্তু তখনও ধরাই রয়েছে ধনার হাতে, ধনা তার হাতখানি দু হাতে আঁকড়ে ধরে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

হালদার মশায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে ধনাকে বললেন, "ঠিক কাজই তুই করেছিস বাবা। যাকে দেবার তার হাতেই দিয়েছিস সে জিনিস। আমারই মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। যাক, এখন বনমালী, তোমার মেয়ের কাছ থেকে তুমি নাও তোমাদের কুলদেবতা।"

ধনা ফিনকি ফিনকির মা একসঙ্গে মুখ ফিরিয়ে তাকাল বনমালী ঠাকুরের দিকে। ফিনকির মা একবার হাঁ করলেন কিছু বলবার জন্যেই বোধ হয়। বলতে কিছুই পারলেন না, চোখ বুজে মুখ গুঁজড়ে বসে পড়লেন ছেলেমেয়ের পায়ের কাছে।

বনমালী ঠাকুর ফিরেও তাকাল না সেদিকে। হালদার মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, "পাথর হালদার, স্রেফ এক টুকরো পাথর! ওতে প্রাণ নেই, হৃদয় নেই, কিচ্ছু নেই। ওই পাথরের টুকরোয় আর আমার কোনও দরকার নেই। তুমি মরতে বসেছ শুনে

কাল যখন ওই জিনিসটার জন্যে তোমার কাছে এসেছিলাম, তখন আমারও মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। এক বোঝা নোড়ানুড়ি, ইট-পাটকেল সর্বাঙ্গে ঝুলিয়ে বয়ে মরছিলাম, তাই ওই পাথরের টুকরোটার মায়া ছাড়তেও প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল। আজ দেখ, সব বিসর্জন দিয়ে এসেছি। শেষরাতে ঝাড়া হাত-পা নিয়ে সরে পড়ছি কালীঘাট থেকে, পেছনে এসে আছড়ে পড়ল ওই মেয়ে। বাস্, সব মতলব ভেস্তে গেল। ওর মুখখানা রাস্তার আলোয় ভাল করে দেখে কোনও কিছুই মনে রইল আর তখন। তুলে নিয়ে কুণ্ডের ধারে এলাম, ওর মুখে চোখে জল দেবার জন্যে। ধরা পড়ে গেলাম, আর আশ্চর্য ব্যাপার কী জান হালদার, জ্ঞান হতে মেয়েটা জোর করে আমার বুক থেকে ছিটকে গিয়ে ছ হাতে আঁকড়ে ধরলে ওই ওকে। তখন ওই ছেলে ওই মেয়েকে ছু হাতে জড়িয়ে ধরে চেঁচাতে লাগল, 'চোর চোর, এই লোকটা একে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে।' এত লোকের মুখের ওপর জোর গলায় বলে ফেললে, 'ও আমার পরিবার।' তখন যদি ওর মুখ-চোখের অবস্থা দেখতে হালদার! নিজের পরিবারের মান-ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে ও হন্যে হয়ে উঠেছে তখন। আসল ব্যাপারটা আমার চোখে ধরা পড়েছে হালদার। পাথরে আর আমার কোনও দরকার নেই। আমি দেখতে পেয়েছি ওদের, ওরা জন্মেছে, ওরা বড় হচ্ছে, ওরা ওদের নিজেদের মান-ইজ্জত বাঁচাতে জানে। কোনও ঢাকাঢাক গুড়গুড়ের পরোয়া করে না ওরা। যদি কোনও দিন এই তীর্থের উদ্ধার হয়, তো ওদের হাত দিয়েই তা হবে। গুপ্ত সাধন-ভজন সিদ্ধিলাভ এই সব গোঁজামিলের পথে কোনও কালে কালীঘাটের কালীকে জাগানো যাবে না। যদি ইচ্ছে হয়, বিশ্বাস করতে পার, চৈতন্যস্বরূপা আদ্যাশক্তি জেগে উঠেছেন ওদের বুকে। কারণ লুকিয়ে কোনও কিছু করার ওদের গরজ নেই কিনা।"

চতুরানন চৌধুরী আর থাকতে পারলেন না। নিচু হয়ে বনমালী ঠাকুরের ছু পা জড়িয়ে ধরলেন। বার বার বলতে লাগলেন, "এই কথাই আপনি শোনান ঠাকুর, এই কথাই মানুষ শুনতে চায় আজ। কালীঘাটের এই হতচ্ছাড়া মানুষগুলোকে আপনি ওই কথাই শোনান

ঠাকুর, মা-কালী সকলের বুকের মধ্যে রয়েছেন। বুকের মধ্যে তিনি জাগলেই সকলের সব দুঃখ ঘুচবে। তখন আর কাউকে ডালা হাতে নিয়ে পোড়া পেটের দায়ে হন্যে কুকুরের মত ছুটে মরতে হবে না।”

আড়তদার পরানকেষ্ট অতশত কিছুই বুঝলে না। মাঝখান থেকে বলে বসল, “মা-কালীর দায় পড়েছে আমাদের দুঃখ কষ্ট ঘোচাবার জন্যে। মার যেন চোখ নেই, মা যেন দেখতে পায় না, আমরা তার চোখ তিনটেকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে ছাপিয়ে এক শো রকম মজা লোটবার ফন্দি আঁটছি মনে মনে। আর মুখে বলছি, ‘মা, একবার চোখ তুলে চাও গো। একবার চাও চোখ খুলে, থাক আর একবার অন্ধ হয়ে চোখ বুজে, যখন যেমন দরকার হবে আমাদের।’ আহা-হা, আধিক্যেতা দেখ না। চল গো মা-ঠাকরুন, নাও ওঠ। নে রে ফনা, বোনাইটাকেও পাকড়ে নিয়ে চল্। সামনেব একটা ভাল দিন দেখে সাতটা পাক ঘুরিয়ে দিলেই হবে ’খন।”

এক ছটকায় ধনা আর ফনার হাত থেকে নিজের দুখানা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফিনকি ছুটে এসে জাপটে ধরল তার বাপকে।

বনমালী ঠাকুর চোখ বুজে নিঃশব্দে মেয়ের রুক্ষ মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

একে একে প্রায় সকলেই বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। হাকিম সাহেব পুলিস অফিসারকে নিয়ে চলে গেলেন। তাঁদের যা জানার ছিল, জানা হয়ে গেছে। যাদের মেয়ে, তারাই ফিরে পেয়েছে মেয়েকে। সুতরাং বে-আইনী কিছু হয় নি। মেয়ে ফিরে পেয়ে মেয়ের মাও চলে গেলেন ছেলেমেয়ে নিয়ে। আড়তদার পরানকেষ্ট হবু জামাইটিকেও রেখে গেল না। ধনাকেও তিনি কাজকর্ম শেখাবেন তাঁর আড়তে। সাইকেলের দোকান আর তাকে খুঁজে বার করতে হবে না। বনমালী ঠাকুরও চলে গেল, কারণ মেয়ে ফিনকি বাপকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজী হল না। তপু তারু বউমায়েরা ছেলেমেয়ে নিয়ে নীচে চলে গেল, তাদের সংসার আছে। তা ছাড়া বাপের কাছে ঠায় পাহারা দেবার দরকারও আর নেই। পঞ্চানন ভটচায স্পষ্ট করে বলেই ফেললেন সেই কথা। বললেন, "আর ভাবনা কী গো তোমাদের! এবার তোমরা নিশ্চিন্তি হয়ে ঘর-সংসার সামলাওগে যাও। যাঁর দায় তিনিই যখন এসে পড়েছেন তখন আর ভাবনা কী!"

সুতরাং যাঁর দায় তাঁকেই এবার কথা বলতে হল। এতক্ষণ তিনি মুখ টিপে একধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এক পা এগিয়ে এসে বউমায়েদের বললেন, "হ্যাঁ মা, তোমরা যাও এখন ছেলেপুলেদের নাওয়ানো-খাওয়ানোর ব্যবস্থা করগে।"

ত্রিপুরারি হালদার একান্ত কৃতার্থ হয়ে বললে, "কাল যদি আপনি আসতেন মাসীমা, কী অবস্থাতেই কাটছে আমাদের কাল থেকে!"

তারকারি বললে, "কালই তো আমি বললাম, ওঁকে নিয়ে আসিগে। তা তোমরা বাবার ভয়ে রাজী হলে না যে!"

ওরা সব বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাপের ভার যার হাতে দেওয়া উচিত, তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল। যাবার আগে বউমায়েরা নিচু গলায় বলে গেল, "একটু পরে আপনিও

নীচে আসুন মাসীমা। স্নান-আহ্নিক সেরে জল মুখে দিয়ে আবার আসবেন।"

সবই শুনলেন কংসারি হালদার মশায়, চোখ পিটপিট করে চেয়েও দেখলেন সব-কিছু। তারপর তিনি চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন, কোথায় লুকবেন তাঁর মুখখানা!

এ কী হল! ওকে এরা চিনলেই বা কেমন করে! ওই বা কেন এল এখানে! লজ্জা শরম ভয় ডর সব বিসর্জন দিয়েছে নাকি একেবারে?

চোখ বুজেই একান্ত কুণ্ঠিত কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার কী হবে তা হলে?"

যাঁর দায় তিনিই জবাব দিলেন। অকপট সহজ সুরে বললেন, "হবে আবার কী? এবার আমরা কোনও তীর্থস্থানে চলে যাব। যেখানে গেলে শরীর মন ভাল থাকবে, এমন কোনও ভাল জায়গায় চলে যাব আমরা। কিছুদিন শান্তিতে থাকলেই আবার উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবে তুমি। আজই আমি বলছি ছেলেদের যাবার ব্যবস্থা করতে। এখন যত তাড়াতাড়ি হয়, এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলেই ভাল।"

হালদার মশায়ের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, "কিন্তু সেই লোকটা—"

একান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি বললেন, "সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। আমার তপু-তারুর মত দুই ছেলে আছে, আমাকে আর কেউ জ্বালাতে সাহস করবে না।"

বড় মিশ্র মশাই এক কোণায় বসে নাম করছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি কথা বললেন। কথা বলতে গেলেই তাঁর মাথাটা দু পাশে দুলতে থাকে আর গলাটা ভয়ানক কাঁপে। বেশীক্ষণ চালাতেও পারেন না তিনি কথা, কাশি শুরু হয়ে যায়।

গলা কাঁপিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "তাই যাও মা, কাঁসারিকে নিয়ে তুমি চলে যাও কোথাও। যেখানে গেলে ও সুস্থ হয়, সেখানে

নিয়ে যাও ওকে। কাঁসারি আমাদের ভাল আছে, উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে— এটুকু জানতে পারলেই আমাদের শান্তি। আমার চেয়ে ও অনেক ছোট মা, ঢের ছোট। তবু ও আগে পড়ল আর আমি এখনও চলে ফিরে বেড়াচ্ছি।"

মিশ্র মশায়ের কাশি আরম্ভ হয়ে গেল।

হালদার মশায় আবার বলে ফেললেন, "আপনারা সকলেই চেনেন না কি ওকে?" পঞ্চানন ভটচায হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, "চিরকালটাই তোমার একভাবে কাটল কাঁসারি। কোনও কালে কিছু তুমি চোখেও দেখতে পেলে না, কানেও শুনতে পেলে না। কখনও কারও এতটুকু খবর রাখার গরজ ছিল নাকি তোমার যে, তুমি কিছু দেখতে শুনতে পাবে! ওঁকে চেনে না কে এখানে? ঠেকে ওঁর দরজায় গিয়ে হাত পাতে নি এমন কেউ আছে না কি কালীঘাটে? পালপার্বণে কালীঘাটসুদ্ধ বামুনকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে উনি বিদেয় দিয়েছেন। ওই যে হতভাগা ডালাধরাগুলো, কবে ওরা লোপ পেত কালীঘাটের মাটি থেকে যদি উনি বুক দিয়ে আড়াল করে তাদের না বাঁচাতেন! কবে একবার নাকি তুমি ওঁর সামনে বলেছিলে, কালীঘাটের মানুষের হাড়ির হাল ঘোচানোই তোমার স্বপ্ন। সে স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে তোমার ওই শিষ্যানী প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তুমি তো কিছুতেই কিছু দেখবে না চোখ চেয়ে। কংসারি হালদারের মুখের সামনে চোখ তুলে কেউ কথা কইতে পারে না, এই গর্বে অন্ধ হয়ে থেকেছ তুমি চিরকাল। আর স্বপ্ন দেখেছ, একদিন তোমার ওই মা-কালী চার হাতে সবায়ের দুঃখ ঘুচিয়ে দেবেন। কস্মিন কালেও তা হবে না হালদার, মার চারটে হাতই যে জোড়া। তাই তিনি যা করার তা মানুষের হাত দিয়েই করান।"

বড় মিশ্র মশায় সামলেছেন তখন কাশি। বললেন, "অত কষ্ট করতেই বা যাবেন কেন মা-কালী? সব কাজই কি আমরা মা-কালীর সঙ্গে পরামর্শ করে করি যে, মা আমাদের সব-কিছু সামলে দেবেন? মা স্পষ্ট জানতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন যে, কত-কিছু আমরা তাঁকে

লুকিয়ে করি। কাজেই তিনি চোখ বুজে আছেন, আমাদের দিকে আর কখনও চোখ তুলে চাইবেন না। কী বল গো মা-ঠাকরুন?"

মা-ঠাকরুনকে আবার মুখ খুলতে হল। বললেন, "না না, তা কেন হবে মিশ্র মশায়! আমরা হলাম সন্তান, আমরা হাজারবার অন্যায় করতে পারি, ভুল করতে পারি। ওই তো আমাদের স্বভাব। তার জন্যে মা কি কখনও মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারেন! তা হলে মায়ের দয়াময়ী নামই যে মিথ্যে হয়ে যায়। মা যা করবার ঠিকই করছেন। ওই তপু তারু ফনা ফিনকি ধনা ওদের বুকে মা জেগে উঠেছেন। যা করবার ওরাই করবে এবার। লুকিয়ে করার মত কোনও কাজ ওরা করতে পারবে না, কাজেই ওদের দিকে নজর রাখতে মায়ের কষ্ট হবে না।"

কলিতীর্থ কালীঘাট।

আদ্যাশক্তি মহামায়ার মহাপীঠ।

ভাগীরথীর কূলে একদা ছিল সেই মহাতীর্থ। তখন কালীঘাটের ঘাটে জোয়ার-ভাঁটা খেলত, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় পাহাড়-প্রমাণ উঁচু হয়ে বান ডাকত, দেশ-বিদেশ থেকে পালতোলা জাহাজ এসে ভিড়ত।

অদ্ভুত-সাজপোশাক-পরা বোম্বেটেরা নামত সেই সব জাহাজ থেকে কালীঘাটের তটে। দেশ-বিদেশ থেকে মানুষ ধরে এনে তারা কেনা-বেচা করত কালীঘাটের হাটে। ফিরে যাবার সময় মহাপীঠের মহাশক্তিকে তুষ্ট করার জন্যে বিস্তর মানুষ বলি দিত তারা। বলি দিয়ে প্রার্থনা জানাত একান্ত সোজা ভাষায়—

"মা গো, এবার যেখানে চলেছি লুটতরাজ করতে, সেখান থেকে যেন ফিরতে পারি কাজ হাসিল করে।"

সে-সব দিন বড় শান্তির দিন ছিল মা-কালীর, ভক্ত সন্তানদের প্রার্থনা বুঝতে একটুও কষ্ট হত না তাঁর। তাই তিনি খপ করে তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে ফেলতেন।

তারপর একদা ভাগীরথী মরে যেতে লাগল।

জাহাজ আসা বন্ধ হয়ে গেল। লম্বা লম্বা ডোঙা-ভরতি পাঁঠার আমদানি হল তখন কালীঘাটে। কালীঘাটের হাট আর মানুষের হাট রইল না, পাঁঠার হাটে পরিণত হল।

মহামায়ার মহাপীঠে বিস্তর পাঁঠাবলি শুরু হয়ে গেল তখন। পাঁঠার ব্যাপারীরা পাঁঠাবলি দিয়ে ফেরবার সময় পাঁঠার ভাষায় প্রার্থনা জানাতে লাগল মায়ের কাছে। সে প্রার্থনায় যত প্যাঁচ তত পচা গন্ধ। সেই প্যাঁচালো প্রার্থনা শুনতে শুনতে আর পাঁঠাবলি দেখতে দেখতে মায়ের কালো মুখ আরও আঁধার হয়ে উঠল।

তারপর একদা ভাগীরথী শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

পচা পাঁক আর মরা কুকুর-বেড়ালে ভরে উঠল ভাগীরথীর বুক। কোনও দেশ থেকে কোনও তরীই আর আসতে পেল না কালীঘাটের কূলে। মানুষ পাঁঠা কোনও কিছুই উঠল না আর কালীঘাটের হাটে। সেই শুকনো ডাঙায় বসে মা-কালী শুকনো চোখে তাকিয়ে রইলেন কেওড়াতলার পানে।

তারপর একদা একটা আইনের হাট বসল মরা গঙ্গার ওপারে। আবার জাঁকিয়ে উঠল কালীঘাট। কালীঘাটের হাটে আইনের বেচা-কেনা জমে উঠল। মাকে শিখতে হল আইনের মারপ্যাঁচ। এ-পক্ষ ও-পক্ষ দু পক্ষই মায়ের সামনে প্রার্থনা জানাতে লাগল, "মা, কাজ হাসিল করে দাও। আইনের খাঁড়ায় শত্রু যেন কচুকাটা হয়ে নিপাত যায়।"

কোনও পক্ষের প্রার্থনাই কানে তুললেন না মা। কে যায় ওই বিষম ফ্যাসাদে মাথা গলাতে! এ পক্ষ ও-পক্ষ দু পক্ষই ফতুর হয়ে ফিরতে লাগল কালীঘাটের হাট থেকে।

তবু দু-একটা মানুষ তখনও রয়ে গেল কালীঘাটে, যারা স্বপ্ন দেখতে লাগল। স্বপ্ন দেখতে লাগল, ভাগীরথীতে আবার বান ডাকবে। কুলকুল করে দু কূল ছুঁয়ে বয়ে যাবে মা-গঙ্গা কালীঘাটের ঘাটের সামনে দিয়ে। সেই গঙ্গায় মহানিশার অন্তে আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে মহাশক্তির সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষ অঞ্জলি ভরে গঙ্গাজল নিয়ে অর্ঘ্য দেবেন—

ওঁ উদ্যদাদিত্য মণ্ডলমধ্যবর্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ
ইদমর্ঘ্যং শ্রীমদ্দক্ষিণাকালিকায়ৈ স্বাহা।

যে মুহূর্তে সেই অর্ঘ্য পড়বে গঙ্গার জলে, সেই মুহূর্তে দাউ দাউ করে

আগুন জ্বলে উঠবে। জ্বলবেই আগুন, যে সন্তান মহাসাধনার বলে চৈতন্যস্বরূপা আদ্যাশক্তিকে জাগাবে, তার অর্ঘ্যে আগুন জ্বলবেই। সে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে কালীঘাটের সমস্ত কলুষ, ভাগীরথী সেই ছাই বয়ে নিয়ে গিয়ে সাগরের জলে বিসর্জন দেবে।

কংসারি হালদার মশায় স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর কলিতীর্থ মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে আবার। হয়েছে একটি মাত্র সন্তানের মরণজয়ী সাধনার ফলে। সেই স্বপ্ন বুকে নিয়েই তাঁকে কালীঘাট ছেড়ে চলে যেতে হল।

এখন কালীঘাটে গিয়ে মাথা খুঁড়ে মলেও কেউ কংসারি হালদারের দেখা পাবে না। ফিনকি কিন্তু এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে কলিতীর্থের পথে পথে। ফনাও আছে ওই ভিড়ের সঙ্গে মিশে। ধনারা তো আছেই।

তবে ওদের চিনতে পারা মুশকিল। ওরা ভাঙছে, ওরা গড়ছে, ওরা স্বপ্ন দেখে না, ওরা কাঁদতে জানে না। ওরা বরাভয়দায়িনী দক্ষিণাকালীর ধ্যানমন্ত্রও আওড়ায় না। ওদের ধ্যানেব মন্ত্রই আলাদা। ওরা সেই কালীর ধ্যান করে, যিনি আবির্ভূতা হয়েছিলেন অম্বিকার ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটফলক থেকে।

ভ্রূকুটীকুটিলাতস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥

ফনা ফিনকি ধনারা বিশ্বাস করে, তাদের এই ধ্যানের কালী দেখা দেবেনই একদিন কলিতীর্থে। আবির্ভূতা হয়েই সেই মহাশক্তি খেতে

আরম্ভ করে দেবেন। তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি না হলে কিছুতেই কলিতীর্থ জাগবে না।

> সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্।
> সৈন্যে তত্র সুরারীনামভক্ষয়ত তদ্বলম।

সেই সংহারিণী শক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তির পর কলিতীর্থে গিয়ে মানুষের তীর্থযাত্রা সফল হবে।

॥ শেষ ॥